Asutosh College Patrika

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

অক্টোবর, ১৯৮৫

নিবেদন

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মিশ্র, রমেশচন্দ্র দাস ও বিভূতিভূষণ দেবশর্মার কবিতা; সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির বসু, কুমারী মুকুল রায়চৌধুরী ও দেবরঞ্জন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ এবং রণজিৎকুমার গুহের গল্প স্থানাভাবে প্রকাশ করা গেলনা। সেজন্য আমরা দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করার চেষ্টা করা হ'বে।

সম্পাদক-সংঘ

১।১২।৪৫ আশুতোষ কলেজ পত্রিকা।

ASUTOSH COLLEGE
ESTD. 1916
LIBRARY

Published by J. N. Chakrabarty from [illegible] Road, and printed by Bijoy Kumar Ray
from the Bhowanipore Press, [illegible], Asutosh Mukherjee Road, Calcutta

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা
বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা
অক্টোবর, ১৯৪৫

সম্পাদকীয়

মুক্তি-সাধনায় ছাত্রসমাজ :

সম্প্রতি কোন বক্তা বলেছেন, 'বর্তমানে চীন ও অন্যান্য দেশের অগ্রগতির আন্দোলনে সেখানকার ছাত্রসমাজের অবদানের তুলনায় ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ও অগ্রগতির আন্দোলনে অংশ গ্রহণে ভারতের ছাত্রসমাজ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে।' আমাদের মনে হয়, তাঁর এই উক্তিটি ছাত্রদের বিবেচনা করা উচিত। ভারতবর্ষের ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত কিনা—এই নিয়ে বাকবিতণ্ডার অন্ত নেই। মহাত্মা গান্ধী ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা সমর্থন করেন এবং ভবিষ্যতের মুক্তি-সৈনিক রূপে নিজেকে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষাবস্থা থেকেই যুবকদের থাকা উচিত বলে' মনে করেন। এখন প্রশ্ন উঠে যে, রাজনীতির সংগে শিক্ষার বিরোধ বাঁধে কিনা। আমাদের দেশের অভিভাবকরা সাধারণতঃ মনে করেন, ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্যের সংগে রাজনীতির সমন্বয় সাধিত হ'তে পারেনা। বলা বাহুল্য, এই বিরোধী মনোভাবই ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান ভারতবর্ষে আপামর জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভই একমাত্র লক্ষ্য। এমতাবস্থায় শিক্ষা কিছুটা ব্যাহত হলেও ছাত্রদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বকীয় অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে অন্যান্য দেশের ছাত্রদের সংগে সমান তালে পা ফেলে চলা কর্তব্য। তাই ডাঃ রাধাবিনোদ পালের ভাষায় ভ্রাতৃসমাজকে বলি,—স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তোমাদের শিক্ষাকে নিয়োজিত কর (The best way you can prove yourselves worthy of your education ..... is to help in the attainment of freedom for your motherland, which is the immediate problem before her, in the genuine spirit of a crusader)।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রূপ :

যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হ'য়েছে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ যে সমরদানব সমস্ত পৃথিবীবাসীর ওপর চেপে বসেছিল, তা' এতদিনে ধ্বংস হয়েছে। শান্তিবাদী মানুষ অনাবিল ও শিষ্ট জীবন যাপনের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যা'তে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে—তা'র জন্যে পরিকল্পনার অন্ত নেই। এ-পথে যে প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের প্রয়োজন, তা'তে সন্দেহের আর কি আছে? সাম্রাজ্যবাদ

যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, ততদিন হবেনা উন্নততর জীবন ধারণের ব্যবস্থা, আসবেনা মহত্তর স্বাধীনতা, দেখা দেবেনা উৎকৃষ্টতর জ্ঞান-গরিমা। স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে সে ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন আর তুলে লাভ নেই। শুধু বলি, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জন্যে যে-সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা'তে মানবের সার্বিক কল্যাণের দিকটাই যেন সর্বস্ব হয়ে ওঠে। যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে ধ্বংস-যজ্ঞের জন্যে যে-সব অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা'ই যেন মানুষের হিতের জন্য নিয়োজিত হয়। আমরা দেখতে চাই, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নূতনতরো রূপ।

শিক্ষার স্রোত কোনপথে ?

পণ্ডিত স্যার রাধাকৃষণ বলেছেন : বর্তমানে যে সব বিষয়ে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা চলেছে, তা'র মধ্যে শিক্ষাকেই প্রথম স্থান দেওয়া উচিত (Education should have priority among the schemes of reconstruction now being considered)। তাঁ'র এই উক্তিটা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কারণ জাতীয় উন্নতির অন্য সব সমস্যাই প্রধানতঃ শিক্ষামুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষের শিক্ষা সুস্থ ও সুষ্ঠু নয়, কেরাণী গড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে মেকলে যে শিক্ষা-পদ্ধতির বৃক্ষ-শিশু রোপন করেছিলেন, তা' ফলমূল দিয়ে হয়ত ইংরেজের রাজ্য-রক্ষা নামক বুড়োশিবের পূজোর প্রয়োজনটা মেটাচ্ছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় উন্নতির মহাযজ্ঞে বন্ধ্যাত্বের পরিচয় ছাড়া আর কি দিতে পেরেছে ? যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য রচিত শিক্ষা-বিষয়ক সার্জেন্ট পরিকল্পনা ভালো, না—মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত বনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ভালো—সে আলোচনা আমরা ক'রতে চাইনে,—শুধু বলি, যে-পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা'র যেন একটা জাতীয় ভিত্তি (national basis) থাকে, -- জাতীয় জীবনের সর্ববিধ কল্যাণ যেন নিহিত থাকে তা'র মধ্যে।

উলুখড়ের প্রাণ যায় :

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়—এই প্রবাদবাক্যটি আজের ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রতি পাদক্ষেপে সত্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান মহাসমরকে কংগ্রেস ভারতবর্ষের জাতীয় যুদ্ধ বলে স্বীকার করেননি, বরং ব্রিটিশ প্রভুদের খাসমহলের প্রজা বলেই ভারতবাসীকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হ'য়েছে। অথচ মজার কথা এই যে, যুদ্ধের মাশুল মেটাতে গিয়ে ইংরেজের যতটুকু দুর্ভোগ ভুগতে হ'য়েছে, তা'র চেয়ে অনেক বেশী ভুগতে হয়েছে ভারতবাসীকে। বাঙ্‌লা দেশের কথাই ধরা যাক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মর্মন্তুদ কাহিনী কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। সুযোগ বুঝে রোগদানবেরও কালাপাহাড়ী অভিযান আরম্ভ হয়েছে, শত শত লোক কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কবলে প'ড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বস্ত্র-সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে, নানাস্থান থেকে লজ্জা নিবারণের জন্যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই সব দেখে শুনে মনে হয়, বহুরূপী সমস্যার রাহু বাঙালীকে একেবারে গ্রাস

করবার জন্যে উদ্যত হ'য়েছে। অথচ সরকারের এদের বাঁচবার তত দায়িত্ববোধ যেন নেই, কারণ যুদ্ধসমস্যাই নাকি বিবেচ্য বিষয়। হায় যুদ্ধ!

শিশু-শিক্ষার পটভূমিকা :

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 'শিক্ষার পুনর্গঠন' বিষয়ক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে শিশুদের বাল্যাবস্থা যা'তে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে কাটে, জীবনের যাত্রা যা'তে সুন্দরভাবে আরম্ভ হতে পারে এবং জন্মগত প্রতিভা সকল যা'তে বিকাশের পথ খুঁজে পায়—তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে (secure for children a happier childhood and a better start in life.....provide means for all of developing the various talents with which they are endowed)। শিশু-শিক্ষা সংক্রান্ত এই পরিকল্পনাটি আমরা অত্যন্ত সময়োচিত ও বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করি। কারণ আমাদের দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের প্রারম্ভিক শিক্ষার সুব্যবস্থা নেই ব'ললেই চলে। বাঙ্‌লা দেশে যে 'প্রাথমিক শিক্ষা' (Primary education) চালু হ'য়েছে, তা'ও মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের আশা-স্থল শিশুদের ভবিষ্যৎ যে নিতান্ত অন্ধকারে, তা'তে সন্দেহ নেই। প্রধানতঃ জীবনের জন্মগত মূল্য এক, শুধু পরিবেশই তা'দের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে। সুতরাং মানুষের সম-মূল্যের সংগে সংগে সম-শিক্ষা ও দাবী করা যায়। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল শিশুদের সমান উন্নতির জন্যে শিক্ষাবিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি দেখতে চান —(১) অর্থনৈতিক চাপ থেকে শিশুদের রক্ষার ব্যবস্থা (২) কুখাদ্য থেকে রক্ষার ব্যবস্থা (৩) স্বাস্থ্যহীনতা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা (৪) ভাবগত বিপর্যয় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা (৫) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আধিপত্য থেকে রক্ষার ব্যবস্থা। আমরা ডাঃ পালের মতামত সমর্থন করি, কারণ এ'দেশে উপরোক্ত বিষয়ে সম-ব্যবস্থার অভাবের জন্যেই শিশু-জীবনের বিকাশেও তারতম্য ঘটে থাকে।

আমাদের নানা প্রসঙ্গ

উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যার পর 'আশুতোষ কলেজ পত্রিকার' আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও ভারত গভর্ণমেণ্টের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশই যে ইহার প্রধান কারণ, তা' বলাই বাহুল্য। আমাদের অনেক চেষ্টার পর সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় আমরা কলেজের লেখক লেখিকাদের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করতে পারিনি। তদুপরি যুদ্ধজনিত নানা অসুবিধার জন্যে পত্রিকা সম্পাদনাতেও অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আমরা অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

* * * *

এই বছর থেকে আমাদের কলেজের 'বাণিজ্য বিভাগের 'নৈশ ক্লাশ' বসতে আরম্ভ হয়েছে। ছাত্রদের সংখ্যা নিতান্ত কম হয়নি। দেশের বর্তমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে' কলেজ কর্তৃপক্ষ যে বাণিজ্য

বিভাগের পৃথক আয়োজন করেছেন, এজন্যে তাঁ'রা ধন্যবাদের পাত্র। দক্ষিণ কলিকাতায় এরূপ একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন থেকে অনুভব করা যাচ্ছিল। আশুতোষ কলেজ বাণিজ্য বিভাগ সে প্রয়োজন মেটাতে পারবে ব'লে আশা করি। আমরা বাণিজ্য বিভাগের নূতন বন্ধুদের প্রতি প্রীতি ও অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

* * * *

আমাদের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুত বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ মহাশয় সম্প্রতি কলেজের 'পরিচালক সমিতিতে' অধ্যাপকের প্রতিনিধি (Professors' representative to the Governing Body) নির্বাচিত হয়েছেন। ইহার ফলে পদাধিকার বলে (Ex-officio) তাঁরা অধ্যাপক সমিতি ও অন্যান্য শাখা-সমিতিরও বিশিষ্ট সভ্য। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বিজেনবাবু 'ছাত্রসমিতির'ও (Students' Union) সভাপতি। এতদ্বারা কলেজের ছাত্র থেকে আরম্ভ করে পরিচালক পর্যন্ত সকলের সংগে অধ্যাপক মহাশয়ের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। কলেজের ছাত্রদের সুখ-দুঃখের প্রতি অটুট দৃষ্টি রাখবার জন্যে তাঁদের উভয়কে আমরা অনুরোধ করছি।

* * * *

কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর সুরমা মিত্র শাস্ত্রী শিক্ষকতা বিষয়ে (Dip. Ed.) ডিগ্রি লাভ করবার জন্যে বিলেত যাত্রা করেছেন। পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুত মুক্তিগোপাল চৌধুরী, গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত সনৎকুমার বসু, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা বাণী ঘোষ ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত নীলকণ্ঠ মৈত্র মহাশয়গণও স্ব স্ব বিষয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। আমাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। আশা করি, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ সাফল্য লাভ করে আমাদের কলেজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করবেন।

* * * *

এবার আমাদের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় ও অধ্যাপক শ্রীযুত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় যথাক্রমে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও গ্রীফিথ বৃত্তি লাভ করেছেন। তারাপদ বাবু বাঙ্‌লা ছন্দ সম্বন্ধে এবং বিজনবাবু রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্যের আদিপর্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে উক্ত সম্মানের অধিকারী হ'য়েছেন। এই বৃত্তিপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে ইহাই মনে হয় যে, অধ্যাপক মহাশয়দ্বয় বঙ্গবাণীর সেবাকে শুধু 'বৃত্তি' হিসেবেই গ্রহণ করেননি, জীবনের প্রধান 'ব্রত' হিসেবেও বরণ করে নিয়েছেন। আমরা ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তারাপদবাবু ও বিজনবাবুকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * * *

গত বি, এ, পরীক্ষায় আমাদের কলেজের শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস ও কুমারী নীলিমা দত্ত যথাক্রমে দর্শন ও বাঙ্‌লা অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার কথা। এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কুমারী দত্তই সর্বপ্রথমে আশুতোষ কলেজ থেকে বাঙলা অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা তা'দের উভয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

* * * *

আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুত রমেন্দ্র আচার্য মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যের ও শ্রীযুত নিশীথ কর মহাশয় ভূগোলের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'য়েছেন। তাঁ'রা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তাঁদের যোগদানের পর আমাদের কলেজের অধ্যাপক বিভাগ যে পরিপুষ্ট হয়েছে, তা'তে সন্দেহ নেই। আমরা কলেজের পক্ষ থেকে রমেনবাবু ও নিশীথবাবুকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

* * * *

আমাদের 'কলেজ য়ুনিয়ন' সম্বন্ধেও কিছু বলা কর্তব্য মনে করি। ছাত্র-সংঘের রাজনৈতিক কর্তব্য যেমন প্রতিনিধিরা (representatives) ভুলে যাননি, তেমনি অন্যান্য সবদিকেই তাঁদের অটুট দৃষ্টি ছিল। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাপনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায়, দেশ ও ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনায় 'আশুতোষ কলেজ ছাত্র-সমিতি' এবৎসর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে (স্থানান্তরে ছাত্রসমিতির সম্পাদকের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তাঁদের এ কর্মকুশলতা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেনা—বলা-ই যথেষ্ট মনে করি।

* * * *

'মোদের গরব মোদের আশা—আ মরি বাঙ্‌লা ভাষা'—কবির সংগে সংগে আমরাও বাঙ্‌লা ভাষা সম্বন্ধে গৌরব বোধ করি ; কারণ বাঙ্‌লা আমাদের মাতৃভাষা। প্রত্যেক দেশেই জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের সংগে সংগে স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার অফুরন্ত প্রয়াস দেখা যায়। নিজের যা' কিছু আছে—তা'কে বড়ো করে' তোলার স্পৃহা মানুষকে পেয়ে বসে। এ অন্যায়ও নয়, অস্বাভাবিকও নয় ; বরং এরই নাম জাতীয়তাবোধ। বাঙ্‌লা ভাষা বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রধান বাহন, এর মূল্যে আমরা বিদেশ থেকে জয়মাল্য এনেছি। তাই যদি আমরা জীবনের প্রতি কর্মক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে প্রধান আসন দি', তবে কোন অন্যায় করবো বলে মনে করিনে। এ আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই আমরা চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে 'আশুতোষ কলেজ পত্রিকা'র বর্তমান সংখ্যায় বাঙ্‌লা বিভাগকে আগে স্থান দিয়েছি, বাঙ্‌লায় সম্পাদকীয় লিখেছি, এমন কি, 'আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিন' নামটিকেও 'আশুতোষ কলেজ পত্রিকা'য় রূপান্তরিত করেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'ম্যাগাজিনকে' 'পত্রিকায়' পরিবর্তিত করে কি এমন লাভ রয়েছে ? আমরা বলবো তা'তে নামটি সহজ হয়েছে, মাধুর্য বেড়েছে, উপরন্তু স্বাদেশিকতারও প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ 'ইংল্যাণ্ড' নামটা শুনেই আত্মহারা হয়ে যেতেন, আমরা যদি সামান্য 'পত্রিকা' শব্দটির মধ্যে একটুও স্বাদেশিকতার রস পাই, তবে তা'র ফল ভালোই হ'বে ব'লে মনে হয়। 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু'।

বিহারীলাল ও সারদামঙ্গল

নন্দরাণী কুমার
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী (সাহিত্য)।

কবি বিহারীলাল দেবী-সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে একাগ্র তন্ময়তার সহিত তিনি বাগ্দেবীর বন্দনা গান গাহিতেন—যশঃপ্রার্থী কবিকুলের ন্যায় তিনি বিশ্বের দরবারে সাড়ম্বরে গান গাহেন নাই। নিশিগন্ধা ফুলের মতই তিনি তাঁহার কাব্য কুসুমগুলিকে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া ফুটাইয়া তুলিতেন। অনন্ত নির্জনতার মধ্যে কবির সেই কাব্যকুসুমগুলি গোপন মাধুর্যে বিলসিত হইয়া উঠিত; খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ব্যতীত পৃথিবীর আর কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না।

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বিহারীলালের জন্ম হয়। ১২৩০ সালে মাইকেল মধুসূদনের জন্ম হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে মাত্র ১২ বৎসরের ব্যবধান। তথাপি বিপ্লবী কবি মধুসূদনের কাব্য লইয়া পরবর্তী যুগের সমালোচনা সাহিত্য রসপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যে-কবি একান্তে বসিয়া গোপনে হৃদয়ের ভাব ঐশ্বর্য দিয়া সরস্বতীর অর্চনা করিয়াছিলেন—সেই কবির সাক্ষাৎ কয়েকজন মন্ত্রশিষ্য এবং গুণগ্রাহী ব্যতীত জাতির পক্ষ হইতে সমবেত ভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় নাই। ক্রমে ক্রমে ভাব-পাগল এই মহান কবির কাব্য সম্পদ্‌গুলি অনাদরের ধূলির তলায় অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিল। আধুনিক যুগে, কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত সমালোচক অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল কবি-কীর্তির দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাইয়াছেন। বিস্মৃতির নেপথ্য হইতে ভাবোজ্জ্বল যে-কাব্যলক্ষ্মীকে তাঁহারা আজ বিশ্ব-সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, নিরহঙ্কার কবি-মনের প্রোজ্জ্বল মহিমায় তাহা উদ্ভাসিত। এই পণ্ডিতগণের পথ অনুসরণ করিয়াই আমি আজ বিহারীলাল ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তির নিদর্শন 'সারদামঙ্গল' সম্বন্ধে কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

বিহারীলাল আজীবন সাধনায় যে কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'সারদামঙ্গল'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তাই 'সারদামঙ্গলের কবি' নামই বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক পরিচয়। এই সারদামঙ্গল এবং তাহার কবি সম্বন্ধে আজিও যে বাঙ্গালী বিশেষ সচেতন হয় নাই ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়।

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলের রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে। কিন্তু তাহা সমাপ্ত হয় নাই। এই অসমাপ্ত অবস্থাতেই তাহা 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা আমাদের দেশের বহু প্রাচীন কবিকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনই এই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান উপজীব্য ছিল। বিহারীলালের পূর্বে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মনে হয়, বিহারীলাল নামকরণের দিক্ দিয়া ভারতচন্দ্রের অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যে সারদা কেবল মহিমময়ী মূর্তিতে দেখা দেন নাই, দেখা দিয়াছেন—প্রেমময়ী মূর্তিতে, করুণাময়ী মূর্তিতে—এবং বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর মূর্তিতে। পূর্বের মঙ্গলকাব্যগুলিতে মানুষের মনে ভীতিসঞ্চার করিয়া দেবদেবীর প্রতি ভক্তি আদায়ের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে মঙ্গলকাব্যের সেই চিরাচরিত নীতিগুলি বিসর্জিত হইয়াছে। প্রেমের

মধ্য দিয়া দেবীকে আপন করিয়া লওয়া যে সম্ভব তাহাই সারদামঙ্গলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবির মৃত্যুর পর তৎকালীন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ'এ কবি বিহারীলাল সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের একস্থানে আছে—"সারদামঙ্গল বুঝিতে বিস্তৃত প্রাণ থাকা চাই। সারদামঙ্গল কবি ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না, এইজন্য বলিতে হয় বিহারীলাল কবির কবি।" এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি 'সারদা-মঙ্গল' কত উচুদরের কবিকীর্তির যশ। একটি ভাবোন্মাদ অবস্থায় নিজের মনের কথা এবং বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে তিনি কাব্যরূপ দান করিয়াছিলেন।

সারদামঙ্গলের রচনা সম্বন্ধে কবি নিজে যে কথা বলিয়াছেন তাহারি উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ ও সরস্বতীবিরহ এই ত্রিবিধ বিরহের অশ্রু সরোবরে সারদামঙ্গল কাব্যখানি একটি শিশির মথিতা পদ্মিনীর ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই বিরহ প্রেমকে আরও গভীর এবং ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছিল—বিশ্বের মধ্যে সে-প্রেম পরিব্যাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তি পাইয়াছিল। তাঁহার কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া কবি নিজেই কহিয়াছেন।—

"সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

সারদামঙ্গলে কবি সারদাকেই নানাভাবে স্তুতি করিয়াছেন। কবি চিত্তের সহিত দেবী সরস্বতীর যে সহস্র রহস্যলীলার কথা কবিগণ গাহিয়া থাকেন—এস্থানেও সেই ভাবধারাটীই সারদামঙ্গলের উপজীব্য। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কবির এই সারদা কে? এই সারদা যে কে, এবং তাঁহার প্রেম যে কি বস্তু, কবি নিজেই তাহা বুঝাইতে চাহেন নাই; সারদার সহিত কবির প্রেম মিলন ও বিরহের কথা বলিতে হইলে অনেকগুলি অসম্ভবাদিসম্মত কথা বলিতে হয় বলিয়া কবি নিজেই এই প্রসঙ্গ চাপিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে ইংরাজী সাহিত্যে শেলী যাঁহাকে spirit of beauty বলিয়াছেন কবির সারদা সেই বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী। পরবর্তীযুগে শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।
অয়ুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল চরণে
তুমি চঞ্চল গামিনী।
• • • • • • • • • •
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত না ছন্দে কত সঙ্গীতে রচিত
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
তব অসংখ্য কাহিনী · · · ·

এখানে কি মনে হয় না "কত না ছন্দে কত সংগীতে রচিত" যে সব কাহিনী, তাহার মধ্যে বিহারীলালের সারদামঙ্গলও একটি। এ অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় যখন বিহারীলালের উক্তি শুনি—

আকাশ পাতাল ভূমি
সকলি কেবল তুমি।
অন্যত্র তুমি বিশ্বময়ী কান্তি; দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

'সাধের আসন' নামক কাব্যগ্রন্থে সারদা-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবি উদ্ধৃত অংশ দুইটী রচনা করিয়াছেন। সারদামঙ্গলে যাহা আরম্ভ হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে 'সাধের আসনেই' তাহার সমাপ্তি দেখা যায়। কবির এই সারদা যাহাকে আমরা spirit of beauty বলিয়াছি, তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ",

কেবলমাত্র "সুন্দরী রূপসী"রূপে দেখা দিয়াছেন—কিন্তু বিহারীলালের কাব্যে তিনি মাতা, কন্যা ও প্রেয়সীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

"যে যেমন তার ঘরে
তেমতি মুরতি ধরে
মানবের কাছে কাছে
সদা যে মোহিনী আছে।

এইবারে কবির কাব্যে এই সারদার আবির্ভাব, কবির সহিত তাঁহার বিরহ-মিলনের সহস্রলীলা এবং তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে নানাবিধ মূর্তি গ্রহণ কেমন ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গ পর্যন্ত কেমন করিয়া কবি সারদামঙ্গল গান গাহিয়াছিলেন তাহারি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

সারদামঙ্গলের কবি কাব্যোক্ত প্রথম সর্গের চারিটী গান রচনা করিয়া শুক্লপক্ষের রজনীতে ছাদে বসিয়া বাগেশ্রী রজনীতে পুনঃ পুনঃ সেই গানগুলি গাহিতেছিলেন। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার সহিত কবির গানের সুর মিলিয়া যে একটি মায়াময় সৌন্দর্য-স্বর্গ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই মধ্যে মধ্যে ধীরে ধীরে কবি বাল্মীকির পূর্ববর্তীকাল, বাল্মীকিরকাল এবং বাল্মীকির পরবর্তীকাল এই ত্রিবিধ কালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রথম সর্গে কবি সরস্বতীর রূপ এবং বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের শোকে ক্রৌঞ্চীর বিলাপে পরিপূরিত বিষণ্ণ আবহাওয়ায় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ব্রহ্মার ললাটিকা মেয়ে নামিয়া আসিয়া বাল্মীকির পানে করুণ নয়নে চাহিয়াছিলেন তাহারই অনবদ্য বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠ না করিলে এই বর্ণনার সমগ্র সৌন্দর্য অনুভব করিবার নহে। এই প্রথম সর্গের শেষের দিকেই কবি দেবী সরস্বতীকে হারাইবার ভয়ে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন—

"তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই
করুণা কটাক্ষে তব
প্রাণে পাই অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।

সারদাকে হারাইবার আশংকা শুধু কেবলমাত্র কবি বিহারীলালের নহে—এ আশংকা জগতের সকল কবিরই। কবি রবীন্দ্রনাথও কহিয়াছেন—'ভারতী না থাকে স্থির এক পল এত করি তাঁর সেবা।' তাই কবি অনুক্ষণ ভারতীর ধ্যানে বিভোর—'অন্যমনা যদি হই এক তিল অমনি সর্বনাশ।'

এই সর্বনাশই সারদামঙ্গলের দ্বিতীয় সর্গ হইতে সূচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে কবির সারদা কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্টভাবে কবি চিত্তে ধরা দিয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গের প্রথমেই কবি আক্ষেপ করিতেছেন—

'হারায়েছি রে সাধের স্বপনের ললনা
মানস মরালী মম কোথা গেল বল না.....

এই 'কোথা গেল বল না'র উত্তর আর কেহ দেয় না—কাব্যের মধ্যে তাই কেবল হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাস, পদে পদে কোমল অশ্রুর উৎস—ইহা যেন বৈষ্ণব কবিদের শ্রীরাধিকার আক্ষেপ অনুরাগের অশ্রুজলের ন্যায়। কবি ভাবিতেছেন—'যেখানে সৌম্যমূর্তি স্ফূর্তি ভরা,' 'মহা-পুরুষের মেলা' নাই, যেখানে নন্দন বন তুল্য চির-বসন্ত উৎসব নাই সেখানে কি সারদা আসিবেন?

"সে মহাপুরুষ মেলা,
সে নন্দনবন খেলা,
সে চিরবসন্ত বিকশিত ফুলহার
কিছুই হেথায় নাই
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার?"

কবির হৃদয়ের বিষণ্ণ বেদনা বহিঃপ্রকৃতির চতুর্দিকের ব্যাপ্ত হইয়া গেল। বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তরপ্রকৃতির এই যে নিগূঢ় আত্মীয়তাবোধ ভারতীয় কবিগণ কাব্য-

জগতে ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছেন। কবিরই চিত্তরূপের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়া বহিঃপ্রকৃতিকে কখনও সঞ্চারিণী কখনও বিষাদিনী করিয়া তুলিয়াছে। এই দ্বিতীয় সর্গে সারদা-বিয়োগের যে ব্যথায় কবির মনে হইয়াছে—'মরু মরু মরুময় জীবন লহরী' সে বেদনা আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে তৃতীয় সর্গে বিষাদিনী সারদার দর্শনে।—

"আজি এ বিষণ্ণ বেশে কেন দেখা দিলে এসে
কাঁদিলে কাঁদালে দেবী জনমের মতন ?"

কিন্তু এ বিষণ্ণতা তাঁহার ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে এবং তৃতীয় সর্গে সারদার সহিত পুনর্মিলনের পূর্বে কবি বিলাপ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাহার মধ্যেও একটি বলিষ্ঠ শ্রী আছে। 'বুক ফাটা' সত্ত্বেও তিনি যখন কহিয়াছেন—"ধর আত্মা, ধৈর্য ধর
ছি ছি একি কর কর
নর যদি মরা চাই মানুষের মত।"

অথবা যখন শুনি—"মলুক যতই জ্বলে, পর জ্বালা মালা গলে
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে জ্বলে হলাহল জ্যোতি—"

তখন যেন মনে হয় দুর্বলতা দমন করিবার এক ঐশী ক্ষমতায় কবি বলবান হইয়া উঠিয়াছেন। তৃতীয় সর্গে বিষাদিনী-মূর্তি সারদাকে দেখিয়া কিছুতেই প্রাণ তৃপ্তি পাইতেছে না—কবির এই অবস্থাকে মনে হইয়াছে "বিচিত্র এ মত্তদশা—ভাব বশে যোগে বসা" এই যোগাবস্থায়—কবি জ্যোতির্ময়ী সারদাকে আবার দেখিয়াছেন কিন্তু তাহাও ক্ষণেকের জন্য। আবার স্বপ্ন ভাঙিয়াছে, আবার সারদা অন্তর্ধান করিয়াছেন, আবার কবি কহিয়াছেন—"ওহে ভাই দাও ব'লে, কোন দিকে যাব' চলে ?" যে অস্থিরতায় বৈষ্ণব কবিদের শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন—"পিয়ে বিনে পাঁজর ঝাঁজর ভেলা," সেই অস্থিরতায় বিহারীলালও বলিয়াছেন—"পাঁজর ঝাঁজর মোর দাঁড়াই কোথায় ?" কবির সন্দেহ হইয়াছে—"তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের ফুল ?".....

কিন্তু সন্দেহও টিকিতে চাহে না—তিনি মোহনিদ্রার শেষে যেন তীব্র আশায় বলিয়া ওঠেন—

"এ এক নেশার ভুল
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।"

এই বিচিত্ররূপিণীকে তিনি কখনও অভয়দায়িনীরূপে দেখিয়াছেন, কখনও শ্মশানবাসিনী উদাসিনীরূপে দেখিয়াছেন, কখনও প্রলয়ংকরীরূপে দেখিয়াছেন। কখনও তাঁহার সারদার বিষাদিনী মূর্তি, কখনও করুণাময়ী মূর্তি, কখনও গরবিনী ময়ূরী মূর্তি, কখনও সংহারিণী মূর্তি।

চতুর্থ সর্গে কবি সারদার সন্ধানে হিমাদ্রিশিখর সন্নিধানে যাত্রা করিয়াছেন—এই সর্গ হিমালয়ের বিরাট মহিমা বর্ণনায় পরিপূর্ণ। পঞ্চম সর্গে কবির জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। হিমাদ্রি শিখরে সারদার সহিত তাঁহার বহুবাঞ্ছিত মিলন সম্পূর্ণ হইয়াছে। "মধুর রজনী, মধুর ধরণী মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর" এই এত মধুরতার মধ্যে বিরহের সমস্ত দাবদাহ মিলনের প্রশান্তির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা যেখানে বলিয়াছেন "সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ" সেখানে বিহারীলাল কহিয়াছেন—'বিহঙ্গম খুলে প্রাণ, ধর রে পঞ্চম তান ;" তাই মনে হয় প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহ মিলনের সুর সকল কবির বীণায় সমান আনন্দ বেদনায় বাজিয়াছে।

সারদামঙ্গলের বিষয়বস্তু লইয়া উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, এইবারে দুই চারিটী কথায় বিহারীলালের কাব্য-ধর্মের (সারদামঙ্গল যেমন দেখা যায়) কিছু আলোচনা করিব। বিহারীলালের কাব্যে একটি বাস্তব প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিহারীলাল বস্তু সকলকে আত্মগত ভাব-কল্পনায় রসমণ্ডিত করিয়া তবে তাঁহাকে কাব্য-জগতে স্থান দিয়াছেন। কাব্যে নিছক কল্পনা বিলাসিতা করেন নাই। বিহারীলালের এই যে বাস্তব-প্রীতি—তাহার ফলে বিহারীলালের কাব্য যেন পদ্মের মত তাহার সর্বাঙ্গ শতদল মেলিয়া, বায়ু, আলোক ও

হিমকণা পান করিয়া মধু সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়াছে। Ideal ও realএর এই যে সমন্বয় চেষ্টা বিহারীলালের কাব্যে দেখা যায় তাহার জন্য তাঁহার উদ্ভাবনা অপেক্ষা যাহা আছে তাহা হইতেই সৌন্দর্য স্বর্গ বিরচনের সাধনা লক্ষিত হয়। বস্তুকে তাহার স্বরূপে সুন্দর না দেখিয়া তাহার উপর কল্পিত আলোক সৌন্দর্যে আরোপ করিয়া সুন্দর দেখিবার যে-প্রবৃত্তি, তাহাই কবি মনের (subjectivity)এর লক্ষণ। বিহারীলালকে এই স্বানুভাবাত্মক কবি কল্পনার আদি জনক বলা যাইতে পারে। যদিও মাইকেল ইহার পূর্বে তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে আপন মনের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করিবার প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন—তথাপি এই ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতে মাইকেলের যে আড়ষ্টতা ছিল—বিহারীলালের হাতে সেই আড়ষ্ট ভঙ্গিটী বেশ সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী যুগের কবিগণের মধ্যে নিজের মনোময় জগতের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসার কথাকে এবং বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার যে-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছি বিহারীলালই কাব্যে প্রথম সেই ধারার প্রবর্তন করেন। বিহারীলালের কাব্যে দেখি বিহারীলাল প্রাণপ্রতিমা সারদাকে নানারূপে নানা কল্পনা ফুলে সাজাইয়া নিত্য নূতন ভাবে উপভোগ করিয়াছেন। এই যে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে কোরেছি রচনা—তুমি আমারি হে তুমি আমারি'র মত মনোবৃত্তি—ইহাই subjective কবি মানসের পরিচয়। Subjective কবিতার হৃদয়ানুভূতির সায় বেশি। সারদাকে বিভিন্নরূপে উপভোগ করার মধ্যে ভাবরাজ্যের যে বিবর্তন কবিচিত্তে বিভিন্ন অনুভূতি ও রসোদ্রেক করিয়াছে—তাহারই প্রতিচ্ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে।

এইবার পাশ্চাত্য কবিগণের সহিত বিহারীলালের কাব্যধর্মের একটু তুলনা করিয়া—বিহারীলালের কাব্যের মৌলিক লক্ষণটী স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। কবির নিজের মনোগত একটি আদর্শ থাকে। বাস্তবকে সেই আদর্শ অনুসারে সাজাইবার দিকে থাকে কবির শিল্প দৃষ্টি। কবি কীটসের 'Principle of beauty in all thing'এর প্রথম অনুকরণ দেখা যায় বিহারীলালের কাব্যে। সেইজন্য সৌন্দর্য তাঁহার কাছে রূপাতীত বা বাস্তবাতীত নহে—"প্রত্যক্ষ বিষয় মান

সর্বভূতে অধিষ্ঠান.....

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি দীপ্তি অনুপমা।" এই কান্তির প্রতি বিহারীলাল একটু জোর দিয়াছেন। তিনি বস্তু সকল Idealise করিলেও বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নাই। সারদার সম্বন্ধে কবির যে সৌন্দর্যের আদর্শ তাহাকে শেলীর 'Archetypal Beauty'র সহিত সমপর্যায়ে ফেলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু Shelly Ideaকেই শরীরিণী দেখিতে চাহিয়াছিলেন—

"In many mortal forms I really sought
The shadow of that idol of my thought."

কিন্তু পরিশেষে হতাশ হইয়া কায়াকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। বিসর্জন এই কায়াকে বাদ দিয়া শুধু কান্তিটুকু চাহেন নাই—তিনি বলেন—"বিম্ব গেছে, কান্তি আছে অনুভবে আসে না।" মর্ত্যজীবনের প্রতি বিহারীলালের একটি ভালবাসা ছিল—তাই কবি কীট্‌স নিছক সৌন্দর্য সাধনায় ক্লান্ত হইয়া যাহাদের কথা স্মরণ করিয়া কহিয়াছেন—"They seek no wonder but the human face". বিহারীলাল আদর্শ সৌন্দর্যের পূজারী হইয়াও তাহাদেরই একজন। এইখানেই বিহারীলালের মৌলিকতা। বিহারীলালের কাব্য Ideal ও Realএর সমন্বয়ের মাঝখানে নির্দ্বন্দ্ব হইতে চাহিয়াছে। বিহারীলালের মতে হৃদয়বৃত্তির প্রসার ঘটিলে তাহাতেই বিশ্বময়ী কান্তির অধিষ্ঠান সম্ভব। সুতরাং "কবির যোগীর ধ্যান" ও "ভোলা প্রেমিকের প্রাণ"এর সহিত তিনি মানব মনের উদার সুষমাকে অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তাই বিহারীলালের নিকট কবির স্বপ্নদৃষ্ট সৌন্দর্যের সহিত জাগ্রত জীবনের প্রেমের কোনও সত্যকারের বিরোধ নাই।

বিহারীলালের গীতি-কবিতাগুলিতে ভাবপ্রবণতা থাকিলেও রোমান্টিক কবিমনের যে একটি বিশেষ ভঙ্গী থাকে, রসপিপাসু চিত্তের যে একটু চিরচঞ্চল পরিচয় থাকে, বিহারীলালের কবিতায় তাহার প্রমাণ খুব সুস্পষ্ট নহে।··· একবিন্দু বালুকণার ভিতর সমগ্র জগতের রহস্য স্পন্দন দেখিয়া Wordsworth বিমুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছেন; রাত্রির তারকাখচিত নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে শেলী 'Cloudy Symbols of high Romance' দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু কবি বিহারীলালের কাব্যে সারদাকে পাইবার জন্য একটি সদাজাগ্রত উৎকণ্ঠা দেখা যায় সত্য, না পাওয়ার একটি অতৃপ্তি আছে সত্য কিন্তু এই উৎকণ্ঠা বা অতৃপ্তি Shelly বা Keatsএর উৎকণ্ঠার সমধর্মী নহে। সারদাকে বার বার পাইয়া হারানোর মধ্যে মনোভাবের যে-চঞ্চল রূপটী, যে-উৎকণ্ঠিত অবস্থাটি কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমার কবির একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। ইহাও বিহারীলালের মৌলিকতার লক্ষণ।

বিহারীলালের কাব্যে ভাবের ঐকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী ভাবের মূর্তি ততটা সুস্পষ্ট নহে। এই অস্পষ্ট ভাব সর্বত্র একটি আবছা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া ভাবের মূর্তি স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই বলিয়া তাহা পাঠকবৃন্দের রস-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারেনা। বিহারীলালের সারদামঙ্গলকে একখানি সমগ্র গ্রন্থরূপে পাঠ করাও যায়না। খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তবে তাহার অর্থবোধ হয়। কবি যেমন সারদাকে কখনও পাইয়াছেন, কখনও হারাইয়াছেন। আমরাও তেমনি এই কাব্যের আদ্যোপান্তের অর্থকে কখনও বুঝিয়াছি, কখনও বুঝি নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখেনা, অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটী পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" তাই ইহা মানুষকে বুঝান যায় না—এ রস নিজে উপলব্ধি করিবার—অন্যকে উপলব্ধি করাইবার নহে। তাঁহার কাব্যে তাই রূপ অপেক্ষা ভাবেরই প্রাধান্য। কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির মতো ইহাও তাঁহার কাব্যের একটী মৌলিক লক্ষণ।

ভাষা এবং ছন্দের দিক দিয়াও বিহারীলাল নূতনত্ব আনিয়াছিলেন। কাব্য সৃষ্টিতে ভাষা এবং ছন্দের শৈথিল্য অমার্জনীয় বিহারীলালের এ-জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তাঁহার ভাষা মনের সহজ ভাব প্রকাশের উপযোগী সরল ভাষা। এই কারণে তাঁহার সারদামঙ্গল এবং অন্যান্য কাব্য গ্রন্থেও যে ছন্দ দেখি তাহাতে যুক্তাক্ষরের দ্বারা ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজভাবে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টাই করা হইয়াছে। বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষরের স্থান না থাকিলে সে ছন্দ আদরনীয় নহে। কারণ যুক্তাক্ষর ব্যতীত ছন্দে স্বরের উত্থান, পতন ও তাহা হইতে একটী অপূর্ব Symphony ও Harmonyর সৃষ্টি সম্ভব নহে। যুক্তাক্ষর না থাকিলে ভাষা সুললিত শব্দপিণ্ডমাত্র হইয়া শ্রুতিই শান্তিজনক ও তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে। কিন্তু বিহারীলালের ছন্দ সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় না। সারদামঙ্গলের ছন্দ ও সরল ত্রিপদী কিন্তু এই সরল ত্রিপদীর মধ্যেই গীত সৌন্দর্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের মতে সে "গীতসৌন্দর্য অনুকরণ সাধ্য নহে।" বর্ণনা ভঙ্গীর দিক দিয়াও প্রথম সর্গে সরস্বতীর রূপ বর্ণনা এবং চতুর্থ সর্গের হিমালয় বর্ণনা শিল্পের দিক দিয়া সারদামঙ্গলকে একটী অভূতপূর্ব দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্যধর্মের যে একটী আধুনিক স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে বিহারীলালের ভাব জগতেই তাহার প্রধান উৎসস্থান। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিহারীলালের প্রতিভা স্পষ্ট অনুভূত হয়। বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলের প্রথম সর্গ হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে দুই কবির কিছু কিছু কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। সারদা

মঙ্গলের ১ম সর্গে সরস্বতীর রূপ বর্ণনার সাথে বাল্মীকির প্রতিভায় সরস্বতীর রূপ বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। যেমন :—

এস মা করুণারাণী ;
ও বিধু বদনখানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিগো আবার,
শুনে সে উদাস কথা
জুড়াক্ মনের ব্যথা
এস আদরিণী রাণী সম্মুখে আমার

সারদামঙ্গল ১ম সর্গ।

ইহার সহিত তুলনীয়—

হৃদয়ে রাখগো দেবী চরণ তোমার।
এস মা করুণারাণী ও বিধু বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী রাণী সম্মুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃতরাশি

বাল্মীকি প্রতিভা।

বাল্মীকির প্রতিভায় লক্ষ্মীকে বিদায় দেওয়ার মানসে বাল্মীকির উক্তির সহিত বিহারীলালের উক্তি ভাব ও ভাষার ঐক্য লক্ষ্য করার বিষয়।

যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগীজন তপোবন স্থলে!"

সারদামঙ্গল ১ম সর্গ।

ইহার সহিত তুলনীয়—

যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এ বনে এসনা, এসনা, এসনা এ দীন-জন-কুটীরে।

বিহারীলাল সরস্বতীর বিরহ আশঙ্কায় যে উক্তি করিয়াছেন তাহার সহিত বাল্মীকির সরস্বতী বিরহ আশঙ্কার উক্তি তুলনীয়।

অদর্শন হলে তুমি
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল বনে।
'হা দেবী হা দেবী বলি'
ওঠরি' কাঁদিবে অলি
নীরবে হরিণী বালা ভাসিবে নয়ন জলে।

ইহার সহিত তুলনীয়—

অদর্শন হলে তুমি ত্যজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবেনা কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল বনে।
হা দেবী হা দেবী বলি ওঠরি কাঁদিবে অলি
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির আসার
হেরিব জগৎ শুধু আঁধার আঁধার।

বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরও বহু পদের সহিত রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' 'চিত্রা' 'মরীচিকা' প্রভৃতি কবিতার পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র যে-ধারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রসস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে তাহারই প্রথম ইঙ্গিত আছে বিহারীলালের কাব্যে।

যাহাই হোক শেষে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বিহারীলাল কাব্য ও কবিমনের এমন একটা নিগূঢ় সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, অতঃপর বাংলা কাব্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাবকল্পনার লীলা চলিয়াছে।—কবিগণ জগৎ ও জীবনকে নিজেদের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া যাওয়ার কানন একটা অপূর্ব সুর মূর্ছনায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। কাব্যে আত্মভাব সাধনার এই ভঙ্গী বিহারীলাল হইতেই আরম্ভ।

সাহিত্য ও বাস্তবধর্ম

অজয়কুমার সরকার
(প্রাক্তন ছাত্র)

দীর্ঘকাল ধরে একটা বিরোধ চ'লে আসছে অতীন্দ্রিয়-বাদীর সংগে ইন্দ্রিয়বাদীর, ভাবের সংগে কাজের এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মধ্যে একজনের সংগে আর একজনের —যে সাহিত্য কোনরূপ গ্রহণ ক'রবে এবং এর বিষয়বস্তুই বা কি? কল্পনাই কি সাহিত্যের চরমতম উপজীব্য হবে, না, তার ভিত্তি হবে এই মাটির পৃথিবীর নানা ঘাত-সংঘাত, ঘটনা প্রতি-ঘটনা?

বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী Karl Marx ব'লেছেন যে, মানুষের সমগ্র সৃষ্টির মূলে আছে একটি কথা—'Being determines consciousness'। বস্তুতঃ সমগ্র কল্পনা এবং বাস্তবের সংমিশ্রনের মূলেও এই কথা; এবং সাহিত্য সৃষ্টির মূলে সকলের অপেক্ষা বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম কথা হচ্ছে—বস্তুর বিষয়ে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের চেতনা। মানুষের একটা চেতনা আছে, সেই চেতনা সে কিয়ৎ পরিমাণে হ'লেও সমগ্রভাবেই আপনি সৃষ্টি করে না; কারণ এই চেতনা সৃষ্টির সম্পূর্ণ উপাদান তার একাকীর মধ্যে নেই। সে একটি সমাজের মধ্যে বাস করে; তার পৃথিবী নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিত্যই আবর্তন ক'রছে, এই পৃথিবী এবং সমাজের নানা সুখ দুঃখ, আলোছায়া হ'তে লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং প্রতিটি মনোভাব অবশ্যই তার চেতনা বিকাশে সহায়তা ক'রেছে, তা'র মনস্তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে; এতে কোন দ্বিমত নেই।

সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যা আছে তা হচ্ছে—একক কর্তৃক লব্ধ এই চেতনা এবং মনোভাবেরই রূপভেদে বহিঃপ্রকাশ মাত্র; কারণ মানুষই যেমন সাহিত্য সৃষ্টিকার, তেমনি মানুষই সেই সাহিত্যের বিষয়বস্তুও। 'The aim of an ultimate art.....is an understanding which comprehends all forms and creeds .....' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ব'লেছেন—প্রকৃতির লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে রূপ দেওয়াই তাঁর (বৃহত্তর অর্থে সকল কবিরই) কাজ। সুতরাং 'সত্যকে আপন চেতনাতে গ্রহণ এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলনই হ'ল সাহিত্যের সত্যিকারের সার্থকতা'—এখানে সম্ভবতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই। প্রশ্ন হ'ল এই যে—সেই সত্যের রূপ কি হবে, সেই সত্যকে বিচার ক'রতে হবে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে? এমন কোন সত্য কি আছে যা শাশ্বত, সনাতন, সকল পরিবর্তন এবং সামাজিক চেতনার ঊর্ধে, অথবা বাস্তব পৃথিবীর সংঘর্ষে সেইরূপ সত্যের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তরদান বিশেষ দুঃসাধ্য নয়। বিরাট ধরণীর বিচিত্র সমাজ প্রতিমুহূর্তে অগ্রসর হচ্ছে ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে (thesis এবং antithesis), যার দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে নূতন সৃষ্টি—সেও আবার ঘাত-প্রতি-ঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিমুহূর্তেই যাচ্ছে পরিবর্তিত হ'য়ে। মানব সমাজের মূলে—বাঁচবার এবং ক্ষমতালাভের জন্য যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়া প্রতিনিয়তই চ'লছে—তার ফলেই সমাজ চিরপরিবর্তন-শীল; এবং আমি আগেই ব'লেছি যে, এই সমাজ বিকাশের উপর ভিত্তি করেই কোন এককের চেতনা প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং সত্যের রূপ এবং বিষয়বস্তু অর্থাৎ কোন বিশেষ একক অথবা সমাজ যাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তার রূপও পরিবর্তিত হ'তে বাধ্য; কারণ—'Truth is the expression of man's own intense

investigation of an object, and that investigation is above all a human activity, particularly a social productive' (Ralph Fox.)। পথিক মানুষের দিব্যদৃষ্টি হ'ল সাহিত্য ; পথচলায় সেই দৃষ্টিকে subjective রাখলে তো চ'লবেই না—তাকে তো objective করতেই হবে ; subjective দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে objective সত্যের সংগে এক হ'য়ে যায়, সেইখানেই তো দৃষ্টি নির্ভুল পথদর্শী। তাই দেখি আজ পর্যন্ত যত সাহিত্যের সৃষ্টি হ'য়েছে—কালের সংগে সংগতি রক্ষা করে চলতে হ'য়েছে সকলকেই, যেটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল অস্তিত্বরক্ষা ক'রেছে এবং এখনও ক'রছে..... কালিদাস, Shakespeare প্রভৃতির সাহিত্য.....বুঝতে হবে, এদের লোকোত্তরতার জন্য নয়...অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কালের, লোকের এবং সমাজের সকল মানুষের মানসলোকে আনন্দের দীপ জ্বালিয়েছে ব'লেই তা সম্ভব হ'য়েছে।..... কিন্তু ক্রমবিলুপ্ত সাহিত্যে সাহিত্যিকেরও অসম্মান কিছু নেই ; কারণ সমাজ এবং মানুষ চ'লছে, তারই অগ্রগতির স্বাক্ষর রইল এই প্রাচীনের অবলুপ্তিতে এ-ও গাণিতিক সমাধানের মতই স্বচ্ছ।

ঠিক এরই পরে আরও গভীরতর বিরোধ এবং সমস্যা হচ্ছে আর একটি প্রশ্ন নিয়ে, তা হ'ল এই—সাহিত্য যখন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সমাজবোধের প্রকাশ মাত্র, তখন কি সাহিত্যে একান্ত সমাজগত এবং অর্থনৈতিক বোধগত কতকগুলি বিবরণ ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না—থাকবে না creative art বলে কোন কিছু ?

এ কথা যেমন সত্য যে, উৎপাদনের ভঙ্গিই, যা' অস্তিত্বরক্ষার বাস্তব উপায়, সমগ্র সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং intellectual চিন্তাধারা এবং কার্য নিয়ন্ত্রণ করে, একথা যেমন সত্য যে, প্রচলিত অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্রিয়ার সংগে নূতনতর উৎপাদন ভঙ্গির (mode of production) সংঘাতের ফলাফলের উপরেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, intellectual এবং শৈল্পিক কার্যধারা এবং চিন্তাধারারও পরিবর্তন আনীত হয়, তেমনি একথাও সত্য যে—এই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকেন্দ্রের যে বিস্তৃতপরিধি—রাজনৈতিক সংগ্রাম, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, দার্শনিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তাধারা প্রভৃতিকে গ্রহণ ক'রে আছে—মানসিক চিন্তাধারা এবং শিল্পের সৃষ্টির উপর তাদের প্রভাবও বড় কম নয় ; এবং এই সকল চিন্তাধারা সকল সময়েই অথবা একেবারে প্রারম্ভেই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির সংগে এক না-ও হ'তে পারে ; কারণ মানবের সংগ্রাম হ'ল সমাজ ব্যবস্থা এবং বাস্তব বোধকে আপন বোধিতে গ্রহণ করবার জন্য : সংগ্রাম হ'ল —আপন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন বিষয় সম্বন্ধে যে বিশেষ একটী ধারণা, বিশেষ একটী সৌন্দর্য এবং কল্যাণ অথবা ধ্বংসের সুর আছে—তারই প্রতিষ্ঠার জন্য ; সেই সংগ্রামের গতিপথ সরল এবং সমান্তরাল না হওয়া সকল সময়ে অসম্ভব নয়। সাহিত্যগঠনের অংশও এর মধ্যে বিশিষ্ট। এর কারণও অত্যন্ত স্বাভাবিক ; স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ানুসরণেই অর্থনৈতিক ভিত্তির ক্রিয়া চলতে থাকে, কিন্তু সমাজগত প্রতি ব্যক্তি কর্তৃক সেই সংগ্রাম কোন-রূপে তাদের চেতনায় গৃহীত হবে, তারই উপর নির্ভর করে সাহিত্য সৃষ্টি বা শিল্প-সৃষ্টির রূপ। এমন হ'তে পারে যে—কোন শিল্পী, সাহিত্যিক বা ব্যক্তি বিশেষের নিকট নূতন সমাজ ব্যবস্থা আদৃত নয়,—ঘৃণিত। সে ক্ষেত্রে তার দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য বা শিল্প বা মতবাদ যে পরবর্তীকালে ধ্বংস হবে এ নিশ্চিত, কিন্তু সেইজন্য তা' যে মোটেই সৃষ্ট হবে না—এরও কোন কারণ নেই ; অথবা এও পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হ'তে পারে যে, এক সামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তির মনে দাগ কাটবে বিভিন্নরূপে, তাদের মানসিক এবং বাস্তব গঠন অনুসারে পৃথিবীর সৌন্দর্য নানা জনের কাছে প্রতিভাত হবে নানা রূপে ; কারণ.....'According to the materialist connection of history the determining element in history is **ultimately** the production and reproduction in real life.....

If therefore some body twists this into the statement that the economic element is the **only** determining one, he transforms it into a meaningless, abstract and absurd pharse' (Engels)। সুতরাং এই বাস্তবজগতেই creative art এবং artistic creation যেমন সম্পূর্ণ সম্ভব তেমনই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সংগত। সেইজন্য একথা সত্য নয় যে, কোন অর্থনৈতিক যুগ শেষ হয়ে নূতন যুগ আরম্ভ হবার সংগে সংগেই শিল্পের গঠন এবং অন্তর্ভাবও (form and contents) তৎক্ষণাৎ সেই পরিবর্তনের রূপ নেবে, যদিও শেষকালে তারা রূপগত হতে বাধ্য। তথাপি মলয়বিহারী অদ্ভুত কোন শিল্প-শিল্পীর মানসিক বিকৃতিরই ছায়ামাত্র; তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই, কারণ মানুষ তাকে বাঁচতে দেবে না। আজকের সাহিত্য আর লোকের তত আদৃত হয় না কেন'—আমাদের কোন বাঙালী সাহিত্যিকের এই প্রশ্নের উত্তরে মনীষী Romain Rolland সুন্দর হেসে গভীর অর্থব্যঞ্জকভাবে এই ধরণের উত্তর করেছিলেন—'কারণ লোকে আর তার থেকে আনন্দ পায় না বলে, মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তাতে লেখে না বলে' আমার মনে হয় তাঁর কথাটা নির্জলা সত্য। সেই সাহিত্যই হবে প্রগতিশীল, হবে আদৃত, হবে গ্রহণীয়, যাতে জড়িয়ে আছে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের ইংগিত, মানব সমাজের সুখ-দুঃখ, জড়িয়ে আছে ঘাত-সংঘাত, বিচিত্র মানসলোকের সহজসাধ্য অঙ্কন, যা দেখে মানুষ ব'লবে—'এ সাহিত্য সেই সার্বজনীনতা'। সাহিত্যে এই আবেদন যত গভীরতর হবে, বৃহত্তর মানবসমাজকে সে ততই আকর্ষণ ক'রবে, আনন্দ দেবে এবং বলাই বাহুল্য, যে অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সকল মানুষকে গ্রহণ করতে উৎসুক, তার রূপদানই হ'ল বৃহত্তম মানবকে আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়।

সর্বশেষ প্রশ্ন হ'ল এই যে,—তবে কি ব্যক্তির কোন বিশেষ স্থান নেই সাহিত্যে শিল্পে? তা যদি না থাকে অর্থাৎ সাহিত্য এবং সাহিত্যিককে বাহ্যিক অনুশাসনই মেনে চলতে হয় তবে সাহিত্যিকের প্রতিভা স্ফুরণের অবকাশই বা কোথায় আর সাহিত্যের বিষয়বস্তুর নূতনত্বই বা কি? এ-তো সংগত এবং স্বাভাবিক যে—কোন এক ব্যক্তির মনে এমন ভাবের ব্যঞ্জনা বা অনুভূতি থাকতে পারে যা অন্য সকলের থেকে পৃথক; এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য যে ক্ষেত্রে অধিকাংশের থেকে পৃথক হবেই—তাই বলেই কি এটা কোন বৃহৎ সৃষ্টি নয়?

এর নির্ভুল উত্তর হ'ল এই যে, সমাজের অনুশাসন এবং প্রাধান্য মানে তো ব্যষ্টির বিলুপ্তি নয়ই—বরং তার বিপরীত। সমাজে নিয়তই বিভিন্ন একক ইচ্ছার (individual wills) পারস্পরিক সংঘাত চ'লছে (যে একক ইচ্ছার প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন সংঘাতের ফলে সৃষ্ট)। সেই সংঘাতের ফলে যে সাধারণ ইচ্ছার (collective will) সৃষ্টির হয়—তা কোন বিশেষ এককের দ্বারা ইঙ্গিত নয় বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সংগ্রামরত সকল ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ভাব বা অনুপ্রেরণাই তাতে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। বরং এই কথা সত্য যে, পূর্বেকার প্রত্যেকটি ইচ্ছা বা প্রেরণার প্রতিটি অংশই এই নূতন সমষ্টিগত ইচ্ছার মধ্যে নিহিত আছে।

সুতরাং ধরণীতে যে বিভিন্ন সাহিত্য বিভিন্ন প্রেরণা ও অনুভূতির ফলে সৃষ্ট হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের বিশেষ মূল্য আছে এইরূপে, যে—এদের সংঘাতে যে নূতন ধরণের সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হবে, তার ভিত্তি সংগঠনে এদের প্রত্যেকের দান আছে;—কারণ মানুষ যেমন সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট জীব, তেমনই সে নূতন সমাজের সংগঠকও বটে,—সে যেমন artist তেমনি object of art, যেমন সাহিত্যিক তেমন সাহিত্যের বিচারকও এবং এদের সকলকে নিয়ে যে 'পূর্ণ মানুষ', সাহিত্য হ'ল তার-ই। তার এই দ্বৈতরূপের ফলে নূতন সৃষ্ট সাহিত্য অথবা শিল্পের বিষয়বস্তুরূপে সে যেমন সামাজিক ইচ্ছা পালন করে, তেমনই সেই সাহিত্যের সংগঠকরূপে তার ব্যক্তিগত প্রেরণা

বা আপনভাবের স্ফূর্তিরও একটি বিশেষ দাম আছে। বিশেষ বক্তব্য হ'ল এই যে—সামাজিক আবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর যে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা তার আয়ু হবে শুধুমাত্র দীর্ঘতর নয়, সুন্দরতরও এবং more creative ; কারণ সৌন্দর্য সেখানে বাস্তব। কারণ অন্যান্য পশ্চাদপদ সাহিত্য তাদের বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টির সংঘাত দ্বারা যে নূতন আশা, উন্নততর ভাবী সাহিত্য ও সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি ক'রতে চ'লেছে—এই সাহিত্য ইতিমধ্যেই আপনার থেকে তাকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইজন্যই জগতে সকলের থেকে দীর্ঘায়ু সাহিত্য হচ্ছে 'লোক সাহিত্য', যা হ'ল সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা, যার সংগে সকল মানুষের নাড়ীর যোগ। সর্বদাই এই নূতন আশা, নূতন পৃথিবীর পথ প্রস্তুত। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রেছিলেন ব'লেই Voltaire, Rousseau ও Gorkieএর সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ creative artএর মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকায়' এই এগিয়ে চলার সুর আছে ব'লেই দেশে দেশে মানুষ আপন জনের মত তাকে গ্রহণ ক'রেছে।

সেইজন্য আমার ধারণা—এই বস্তুতন্ত্রবাদীরা সাহিত্যকে যে সর্বদা এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন, তা সেই 'art for arts' sake' বাদীদের থেকে নিশ্চয়ই বেশী ; কারণ এঁদের কাছে সাহিত্য শুধুমাত্র মানসিক বিলাস নয়,--সমাজের অগ্রগমনের প্রয়োজনীয় সাথী ও শিক্ষক ; সৌন্দর্যানুভূতিকে বৈজ্ঞানিক এবং সহজতম উপায়ে মানুষের মনে সঞ্চারিত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় ; সাহিত্য এঁদের কাছে ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি-স্ফূরণের শ্রেষ্ঠ পথ। কারণ শৈল্পিক প্রতিভা স্ফূরণের স্থান ও সুবিধা (scope) এখানে সকলের চেয়ে বেশী। একথা একান্ত সত্য ব'লেই সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বস্তুতন্ত্রবাদী Leninএর বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রে আমরাও বলি—'It must let its roots go down deep into the very thick of masses. It must unite the feelings, thought and will of these masses, uplift them. It must awaken the artists among them and develop them.—Art belongs to the people' (Lenin).

'বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি'

সম্পাদক—জীবেন্দ্র সিংহ রায়

সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্বোধনের সংগে সংগে সাহিত্যেরও উজ্জীবন শুরু হয় ; কারণ—সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণ। ভারতবর্ষ তথা বাঙলা দেশে সে শুভদিন এসেছে। অতীতের দিকে সপ্রশ্ন মনন এবং ভবিষ্যতের দিকে বলিষ্ঠ সন্ধানী নির্বাক্ষা নিয়ে আজ বাঙলা সাহিত্যকেও নতুন রূপে গড়ে তুলতে হবে, নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করা চাই। তবেই আমাদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের রাজসূয় যজ্ঞ সফল হবে। বাঙলা সাহিত্যের এ অভিষেকের ভার তাদেরই ওপর—যারা নবযুগের অগ্রদূত, যাদের সাধনায় রূপ পাবে ভাবী বাঙলার নতুন সংস্কৃতি।

আশুতোষ কলেজের তরুণ ছাত্রসমাজ মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করবার এই পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই 'বাঙলা সাহিত্য সমিতি' গড়ে তুলেছে। তাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অফুরন্ত। আমরা যখনই যে সভার আয়োজন করেছি, যে প্রতিযোগিতার উদ্যোগ করেছি—অনেক বন্ধুর কাছ থেকে তখনই পেয়েছি প্রচুর সাহচর্য ও সহানুভূতি —বিশেষ করে রণেন বসু, হিমাদ্রি বসু, সোমেন বন্দ্যো', দিব্যেন্দু মজুমদার, সন্তোষ মুখো'র নাম করা যেতে পারে। তাঁদের এ সাহিত্য-প্রীতি শুভসূচক, সন্দেহ নেই।

ASUTOSH COLLEGE PATRIKA

(BOARD OF EDITORS)

1945

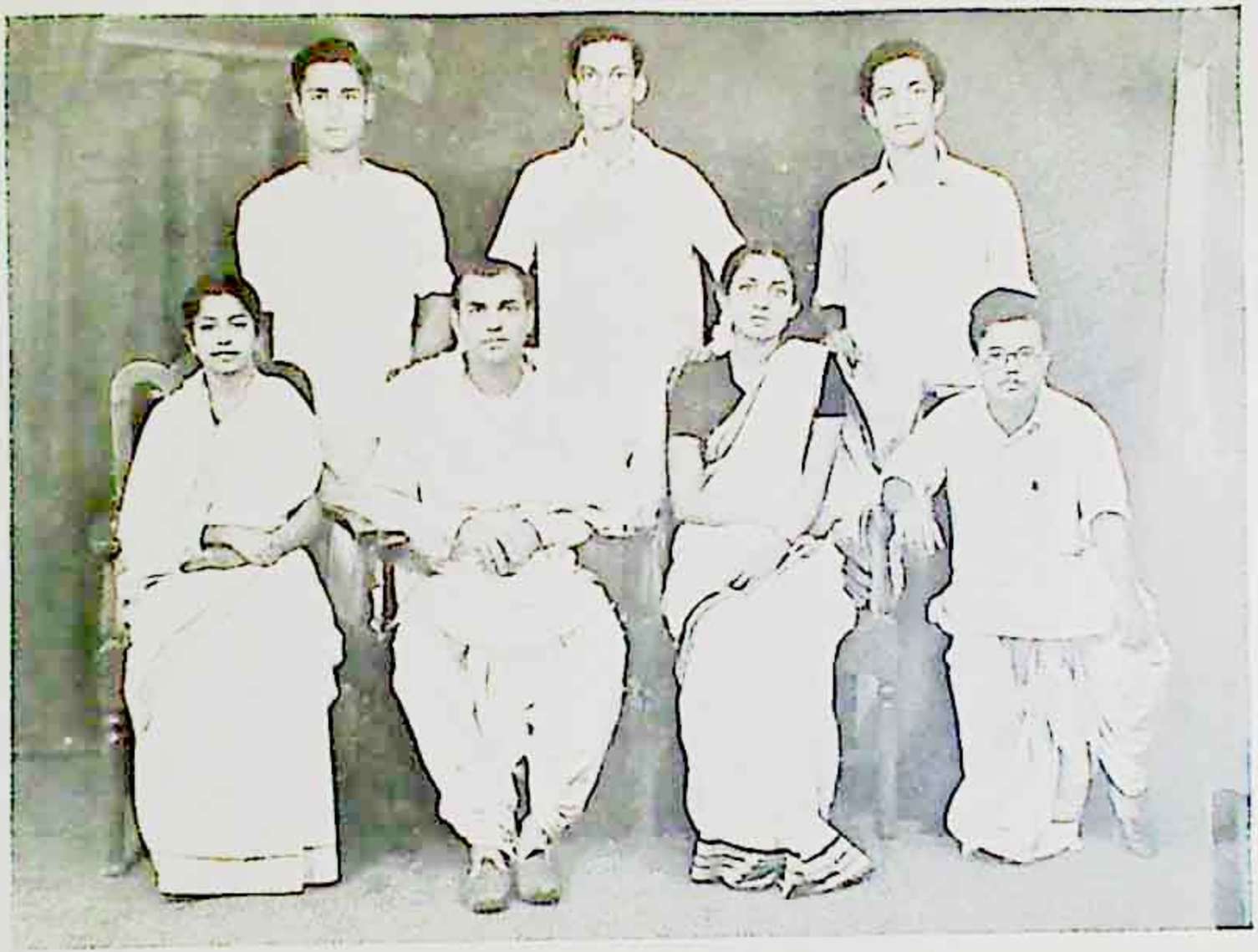

Standing (left to right)—Ranen Bose, Asim Bhattacharya, Amiya Mukherjee

Sitting (left to right)—Indira Bose, Prof. Amiyaratan Mukherjee, Kamala Datta, Jibendra Sinha Roy.

আণবিক বোমা

মধুসূদন গুপ্ত
চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

আণবিক বোমা জিনিষটা কী, এ নিয়ে কাগজে কিছু আলোচনা হ'য়েছে, ভবিষ্যতে আরও হ'বে। জাপান অধিকৃত হিরোসীমার ওপর এই বোমা তা'র যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা'তে সারা সভ্য জগতে একটা বিশেষ রকমের সাড়া পড়ে গেছে।

সূর্য তাপ দেয়, কয়লা নিশ্চয়ই সে ব্যবহার করে না—অত কয়লা যোগান দেবে কে?.....সূর্যস্থ কোন বিশেষ শক্তি তা'হলে এ উত্তাপের সৃষ্টি করেছে, এ'রকমের কোন বিশেষ শক্তির সমাবেশ হয়েছে আনবিক বোমায়।

জল অত্যন্ত চেনা জিনিষ; এর সাহায্যে প্রাথমিক জ্ঞান কিছু আহরণ করা যা'ক; একটা লোহার পাতের উপর জল রেখে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হ'লো, (কল্পনায়) জল টুক্‌রো টুক্‌রো হতে থাকলো, এক সময় আঘাত করা থামা'তে হলো—আমরা সর্বক্ষুদ্র জলকণা পেলাম। এই সর্বক্ষুদ্র জলকণার মধ্যে জলের যাবতীয় গুণ বিদ্যমান—এ'রূপ কণাকে 'মলিকুল' বলা হয়। আবার ঐ মলিকুলকে যদি আঘাত করতে থাকি তবে তা' ভেংগে যাবে—২ ভাগ হাইড্রোজেন আর ১ ভাগ অক্সিজেনে। এদের হাইড্রোজেন-অণু (atom ও অক্সিজেন-অণু বলা হয়। সবকিছু অণু দ্বারা গঠিত—এই ধারণা চলে আসছিলো—পরে গবেষণায় দেখা গেলো অণুতেই শেষ নয়। অণুকে ভাংগা হলো, পাওয়া গেল পরমাণুদ্বয়—'ইলেকট্রন' আর 'প্রোটন' এদের নাম। জগতের যাবতীয় বস্তু 'ইলেকট্রন' দ্বারা গঠিত—এ হলো আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক মত। কিছুকাল আগে জানা গেলো, প্রোটনের আবার দু'টো ভাগ আছে—'নিউট্রন' আর 'পসীট্রন'। নিউট্রনের ওজন প্রায় হাইড্রোজনের সমান। একটা কথা—কল্পনায় হাতুড়ির সহায়তায় আমরা যে সিদ্ধান্তে এলাম—তা' নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হ'য়েছে।

এখন অণু আর পরমাণু কী আমরা জানলাম। অণুর মধ্যে থাকে পরমাণু, সেই পরমাণুর ভাংগনের ফলে শক্তির উদ্ভব হ'য়ে থাকে। এই শক্তিকে যুদ্ধের কাজে লাগাবার চেষ্টায় আণবিক বোমা অর্থাৎ অণুর তৈরী বোমার সৃষ্টি। কোন পথে? তাই বলছি—

বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন, বিরাট শক্তি পেতে গেলে ইউরেনীয়াম চূর্ণ ব্যবহার করতে হ'বে। খনি থেকে ইউরেনীয়াম ধাতু তোলা হ'লো, (এই ধাতু আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৯২টি মৌলিক পদার্থ—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসীয়াম ইত্যাদির মধ্যে সবচেয়ে ভারী হাইড্রোজেনের ওজন ১ ধরে এ-ধাতুর ওজন ৯২) প্রকৃষ্ট উপায়ে পরিশুদ্ধ করেও একে কাজে লাগানো গেল না, বড় মুস্কিলে পড়লেন বৈজ্ঞানিকেরা—মুস্কিলের আসান চাই।

ইউরেনীয়াম চূর্ণের ওপর নিউট্রনের ক্রিয়া নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষনা সুরু করেন অধ্যাপক ফার্মি। এরপর হান ও লিটনার দু'জন অধ্যাপক বেশ খানিক দূর অগ্রসর হ'লেন, তাঁরা বললেন—'ইউরেনীয়াম' পরমাণুর দু'টি সমান ভাগ হওয়ার ফলে—শক্তির সৃষ্টি।

ইতিমধ্যে "আইসোটপস" কা'কে বলে, আমাদের জানতে হ'বে। কোন পদার্থের দু'রকমের অণু আছে, এ'দুটি অণুর মধ্যে রাসায়নিক গুণের কোন পার্থক্য থাকবে না, পদার্থিক গুণের কিছু পার্থক্য থাকলেও থাকতে

পারে, যেমন—এদুই অণুর ওজনের আর চালচিত্র্যের কিছু পার্থক্য থাকে। একেই 'আইসোটপস' বলে।

ইউরেনীয়ামের দু'রকমের অণু আছে, একটির পরমাণিক ভার ২৩৫ অপরটির ২৩৮। অধ্যাপক বর (Bohr) গবেষণা করে দেখলেন, ২৩৫ পরমানিক ভার-বিশিষ্টটাই আসল, এ'তে বিস্ফরণ খুব জোর হয়। কিন্তু ধাতুর মধ্যে অদরকারী ভাগ আছে দরকারী ভাগের ২০০,০০০ গুণ বেশী। আমেরিকায় বিরাট কারখানা স্থাপন হ'লো—১২৫,০০০ কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যে পরিমাণ কার্যকরী ইউরেনীয়াম পাওয়া গেলো তা-ও বৎসামান্য; তাই নিয়ে কাজে নামলেন বৈজ্ঞানিকেরা, সফল হ'লেন তাঁরা। এই বোমা ফাটে কেমন কোরে? ইউরেনীয়াম অণুকে 'নিউট্রন' দিয়ে আঘাত করার ফলে। প্রথম 'নিউট্রন' গুলো তৈরী করা চাই, এবং তা' বোমার মধ্যেই করতে হ'বে, কারণ তৈরী হওয়ার ১/১০০০ সেকেণ্ডের মধ্যেই তা' অদৃশ্য হয়। 'নিউট্রন' তৈরী করার সহজ উপায় ভারী হাইড্রোজেন অণুর সাথে ৩০০০ মাইল প্রতি সেঃ গতিতে একে ধাক্কা খাওয়ানো। ভারী হাইড্রোজেন তৈরী হয় কী করে?—বৈদ্যুতিক আধারের মধ্যে জল নেওয়া হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে জল-'মলিক্যুলকে' 'হাইড্রোজেন' অণু আর অক্সিজেন অণুতে ভেংগে নেওয়া হয়, (সাধারণ হাইড্রোজেনের আনবিক ওজন ১, ভারী হাইড্রোজেনের যা' পাওয়া গেল তা'র আণবিক ওজন ২, ভারী হাইড্রোজেনের তৈরী জল সাধারণ জলের চেয়ে ১০% ভারী, ৫০০ ভাগ সাধারণ হাইড্রোজেনে ১ ভাগ ভারী হাইড্রোজেন থাকে), কিন্তু বোমার মধ্যে এ উপায়ে তো তা' তৈরী করা সম্ভব নয়। অন্য উপায়ে কী করে ভারী হাইড্রোজেন পাওয়া যায় সেই চেষ্টা চললো। দেখা গেল, বোমা থেকে গ্যাসীয় 'অংশ যা' বেরোয় তাঁর গতি প্রায় ৩০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। অতঃপর বিশেষ ধরণের বোমা তৈরী করা হ'লো, যার বিস্ফোরণ হ'বে ভারী হাইড্রোজেনের সাহায্যে। বিস্ফোরণের গোড়ার দিকে এই ভারী হাইড্রোজেন অণুগুলো তীব্রগতিতে চলে, বোমার মধ্যস্থ অন্যান্য ভারী হাইড্রোজেন অণুর সাথে ধাক্কা খায়, তাঁর ফলে নিউট্রনগুলো ফেটে যায়, এই ফাটা-'নিউট্রন' গুলো 'ইউরেনীয়াম' অণুকে তীব্র ভাবে আঘাত করে ভীষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। ইউ-রেণীয়াম অণু ভাংগায় আরও 'নিউট্রন' ছাড়া পায়, এই ছাড়া-পাওয়া নিউট্রনগুলো ইউরেনীয়াম অণু ভাংগতে সুরু করে; শৃঙ্খলাকারে ভাংগার কাজ চলতে থাকে—ভীষণ বিস্ফোরণ এরই ফল।

এই উপায়ে 'নিউট্রন' কণার ধাক্কা খেয়ে ইউরেনীয়াম অণু দু'টুক্‌রো হ'লো, এই দু'টুক্‌রোর ওজন যোগ করলে দেখা যায়, মূল-ইউরেনীয়ামের ওজনের চেয়ে তা কিছু কম। বাকী ওজন গেলো কোথায়? 'পদার্থ লয় পেয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়'—আইনষ্টাইন তা'র আপেক্ষিক তত্ত্বে প্রমান করেছেন। অতএব বুঝতে হ'বে, এ পরিমাণ 'ইউরেনীয়াম' লয় পেয়ে রূপান্তরিত হ'য়েছে শক্তিতে।

এক গ্রাম ইউরেনীয়াম হতে যে পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, তা' পেতে গেলে ২টন কয়লার আবশ্যক; সামান্য ইউরেনীয়ামের অন্তস্থ এই অসামান্য শক্তি কী ভীষণ অনিষ্টই না সাধন করতে পারে! আনবিক বোমা ফাটলে দুলক্ষ কোটী ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড) উত্তাপের সৃষ্টি হয়—কী সাংঘাতিক!

ডাঃ বমন বলেন—'আনবিক-শক্তিকে শত উপায়ে সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।' তাঁর বাণী সত্য প্রমাণিত হো'ক—সভ্যতা সৃষ্টির কাজে তৎপর হয়ে স্বর্গ-সুন্দর শোভনতা লাভ করুক!

কৃত্রিম সার ও ভারতবর্ষ

শৈলেন সেন
চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান

ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ কৃষকের দেশ। শতকরা ৮০% ভাগ লোককে এখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভর ক'রতে হয়। কথায় বলে, খরচ ক'রতে আরম্ভ ক'রলে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়। আমাদের দেশের অবস্থাও সেই রকমের। প্রকৃতি দেবী দু'হাত দিয়ে যে সম্পদ একদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন আমাদের মাটির গর্ভে, তা' আজ বহু বছরের ব্যবধানে নিঃশেষ হ'তে চলেছে। সোনার মাটি আজ আমাদের অনুর্বর, রিক্ত—হা-ভাতের হাহাকার আজ ঘরে ঘরে।

তাই দেশের নেতারা যখন ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত, তখন তাঁদের দৃষ্টি থেকে দেশের কৃষি-ব্যবস্থার চরম দুর্দশার ছবি বাদ পড়েনি। 'বোম্বে-প্ল্যানে' বলা হয়েছে যে, যুদ্ধোত্তর ভারতের কৃষি-জাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৩০% ভাগ বাড়াতে হ'বে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অতটা উচ্চাশা ক'রতে পারেননি। ভারত সরকারের নিযুক্ত Dr. Burns তাঁ'র All India Policy of Post-War Agriculture' পুস্তিকায় ব'লেছেন যে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ শতকরা ৩০% ভাগ বাড়ানো যেতে পারে এবং এই কার্যে সারের উৎকর্ষতা সর্বাপেক্ষা সহায়ক। শতকরা ৪০% ভাগ কাজ এই সারের দ্বারাই হ'তে পারে; এবং এই সংগে যদি কতকগুলি আনুসংগিক ব্যবস্থা (যেমন উৎকৃষ্টতর বীজের সন্ধান, পোকা-মাকড়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি প্রভৃতি) করা যায়, তা'হলে বর্তমানে যে জমিতে প্রতি একরে (acre) ৭৫০ পাউণ্ড শস্য উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ বেড়ে হ'বে ১০০০ পাঃ। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত যে, প্রচুর পরিমাণে সার ও জলের ব্যবস্থা ক'রতে পারলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এ'র চেয়ে অনেক বেশী হ'বে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেন কুর্গ প্রদেশের কথা। সেখানে সাধারণ কৃষক প্রতি একরে উৎপন্ন করে ১৩০০ পাঃ এবং ষ্টেটের ব্যবস্থায় ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০০ পাউণ্ডে। কাজেই মাটিতে যদি সার প্রদানের কোন সু-ব্যবস্থা করা যায়, তবে আমাদের এই চিরদারিদ্র্যের কিছুটা উপশম আশা করা যেতে পারে।

Dr. Burns তাঁ'র রিপোর্টে সার উৎপাদনের বিবিধ ব্যবস্থার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সারকে অন্যতম আসন দিয়েছেন। এদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—এ্যামোনিয়ম্ সলফেট্, এ্যামোনিয়ম্ নাইট্রেট্, ফস্‌ফেট্, ইউরিয়া প্রভৃতির। Dr. Burns এ্যামোনিয়ম্ সলফেটের উপরই নজর দিয়েছেন বেশী, শেষোক্ত তিনটির তিনি উল্লেখ করেননি। আমাদের আলোচনা সব ক'টি নিয়েই—তবে, প্রথমটির আলোচনা একটু বিস্তৃততর হ'বে।

ভারতে যে ধান উৎপাদনের জমি আছে, তা'তে হিসেব করে দেখা যায় যে, বছরে মোট প্রায় ২৫,৫০,০০০ টন এ্যামোনিয়ম্ সল্‌ফেটের দরকার। ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ড থেকে ভারতে চালান আসে ৭৬,০০০ টন অ্যামোনিয়ম সলফেট্ এবং ভারতে তৈরী হয় ২৫,০০০ টন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মাটির চাহিদা অনুযায়ী তা'কে যা' দেওয়া হ'চ্ছে, তা' নিতান্তই তুচ্ছ। গভর্ণমেণ্ট-পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ্যামোনিয়ম্ সলফেট্ তৈরী হ'বে ৩৫০,০০০ টন। কিন্তু তবু ২২ লক্ষ টন এ্যামোনিয়ম্ সলফেটের আরও প্রয়োজন। ভারতের কোথাও কোথাও এ'র মধ্যে এই দিকে বেশ উৎসাহ-জনক কর্মপ্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হ'চ্ছে মহীশূরের বেলাগুলা (Belagula) ও ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের প্রচেষ্টা।

বেলাগুলায় যে ব্যবস্থায় এ্যামোনিয়ম্ সলফেট্ তৈরী হয়, তা'কে মোটমুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পৃথক ভাবে এ্যামোনিয়া ও সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড্ তৈরী এবং দ্বিতীয়তঃ তা'দের পরিমাণমত মিশিয়ে এ্যামোনিয়ম্-সলফেট্ তৈরী। এ্যামোনিয়া তৈরী ক'রতে লাগে ৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩ ভাগ হাইড্রোজেন। এখানে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয় কষ্টিক্-সোডার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে। আর নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয় বায়ুমণ্ডল থেকে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে, এক টন এ্যামোনিয়া তৈরী ক'রতে দরকার হয় প্রায় ২৬৩০ ঘন-মিটর হাইড্রোজেন এবং ৯৪০ ঘন-মিটর বাতাস। আর সলফিউরিক্-এ্যাসিড্ প্রস্তুত হয়, গন্ধক-কে (Sulphur) যথেষ্ট পরিমাণে বাতাসে পুড়িয়ে সলফর-ডাই-অক্সাইডে (So_2) তৈরী করে, এবং আরও নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সলফর-ট্রাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত করে' তা'র সংগে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে।

কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের ব্যবস্থা অন্য রকমের। সেখানে কাঁচামাল গন্ধকের বদলে ব্যবহার করা হয় জিপসম্ (Gypsum, $Caso_4$) নামে এক রকম খনিজ দ্রব্য, যা' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ত্রিবাঙ্কুরের কাছেই ত্রিচীনপল্লীতে। এ্যামোনিয়া তৈরীর পন্থাও এখানে ভিন্ন। বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক (Haber) এ্যামোনিয়া প্রস্তুতের যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন এখানে তা'রই অনুকরণ করা হ'য়েছে। বিগত মহাযুদ্ধে জার্মাণির যখন পৃথিবীর সংগে সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায়, তখন হাবার এই প্রণালীটি বে'র করে' তাঁর জার্মাণিকে আসন্ন পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচান। কারণ বিস্ফোরণ প্রস্তুতের জগতে এ্যামোনিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে' আছে। এ-প্রণালীতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল একমাত্র কয়লা (Coke), কয়লাকে যদি বাতাসের সংস্পর্শে পোড়ান যায় তা' হলে তৈরী হয় Producer Gas (Co & N_2), এবং বাষ্পের সংস্পর্শে পোড়ালে Water Gas (Co & H_2), এই দুই গ্যাসকে একসংগে মিশিয়ে তা'র মধ্যে যদি আবার জলীয় বাষ্প মেশান যায় তা'হলে কার্বন-মন-অক্সাইড্ রূপান্তরিত হ'বে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে—কার্বন-ডাই-অক্সাইড্‌কে তাড়ান নিয়ে। এই মিশ্রিত গ্যাসের উপর তখন চাপ (30 atms.) দেওয়া হয় এবং তা'তেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বেরিয়ে যায়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাসকে কিন্তু নষ্ট হ'তে দেওয়া হয় না। আলাদা একটা ঘরে এ'কে রেখে' দেওয়া হয় এবং এ্যামোনিয়া তৈরী হ'য়ে গেলে তা'কে এ'র সংগে মিশিয়ে আগের চাপের ৬০ গুণ বেশী চাপ নিলে ইউরিয়া (Urea, CO, $NH_2|NH_2$) নামে একটা নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সার হিসাবে এ'র স্থান এ্যামোনিয়ম সলফেটের কাছাকাছি। কার্বন-ডাই অক্সাইডকে সরিয়ে নিয়ে যে গ্যাস-মিশ্রণ পড়ে' রইল—তা'র মধ্যে আছে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন এবং কিছু কার্বন-মন-অক্সাইড্, যা তখনও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হ'তে পারেনি। কাজেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই অপ্রার্থিত দ্রব্যটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন বাকী থাকল আমাদের যা' দরকার, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন। এই দুই গ্যাসকে তখন যথাক্রমে ৩ : ১ পরিমাণে মিশিয়ে যদি খুব বেশী রকমের চাপ দেওয়া হয়, (300 atms) তা'হলে আমাদের প্রার্থিত বস্তু এ্যামোনিয়া বেরিয়ে। আসে এই গ্যাসীয় এ্যামোনিয়াকে তখন জলে মিশিয়ে তা'র সংগে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ও জিপসম যোগ ক'রলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ্যামোনিয়ম্ সলফেট উৎপন্ন হয়। এ্যামোনিয়া এ-ভাবে যা' তৈরী হো'ল তা' থেকে অনায়াসে নাইট্রিক-এ্যাসিড্ প্রস্তুত করা যায়। নাইট্রিক এ্যাসিড্ ও এ্যামোনিয়া আবার একসংগে মেশালে এ্যামোনিয়ম্-নাইট্রেট্ পাওয়া যায়।

কাজেই দেখা যা'চ্ছে যে, ভারতের শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে লক্ষ্য ক'রলে প্রথম প্রণালীর চেয়ে দ্বিতীয় প্রণালী-

টির উপযোগিতা অনেক বেশী। প্রথমত কোন কাঁচামালের জন্য এই প্রণালীতে বিদেশের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না; কাঁচামাল এখানে শুধু কয়লা ও জিপসম। প্রথমটির অভাব ভারতে নেই এবং দ্বিতীয়টি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ত্রিচিনপল্লী ও রাজপুতনায়। কিন্তু প্রথম প্রণালীতে গন্ধকের জন্য বিদেশের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হয়। যুদ্ধের আগে ভারতে সাধারণত গন্ধক আমদানী হ'ত ইটালী থেকে। কিন্তু যুদ্ধের সময় ও-পথ বন্ধ হ'য়ে যায় এবং আমাদের ধর্ণা দিতে হয় আমেরিকার দুয়ারে। কাজেই দেখা যা'চ্ছে যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংগে এ'র ভাগ্য বাঁধা। দ্বিতীয়ত, এ-প্রণালীতে সার হিসেবে যে শুধু এ্যামোনিয়ম-সলফেটই পাওয়া যায়—তা নয়; আরও অনেক রকম উৎকৃষ্ট সারও এ-থেকে পাওয়া যায়; যেমন এ্যামোনিয়ম-নাইট্রেট, ইউরিয়া প্রভৃতি। জিপসমের অভাবে যদি কখনও এ্যামোনিয়ম-সলফেট তৈরী করা সম্ভব না-ও হয়, তবুও কর্তৃপক্ষের চিন্তার কোনও কারণ নেই; কারণ এ্যামোনিয়ম-নাইট্রেট ও ইউরিয়া তবু তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু প্রথম প্রণালীতে প্রথমত শুধু এ্যামোনিয়ম-সলফেট তৈরী হয়, আর কিছু নয় এবং দ্বিতীয়ত গন্ধকের অভাবে ফ্যাক্টরী লাল বাতি জ্বালাতে বাধ্য। তৃতীয়ত এই প্রণালী থেকে মিথাইল এ্যালকোহল (Methyl alco) নামে একপ্রকার মদ জাতীয় জিনিষ তৈরী করা যায়, যা'র প্রয়োজনীয়তা রাসায়নিক ও ব্যবহারিক জগতে খুব বেশী। চতুর্থত, স্বাধীন ভারতে যখন যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের দরকার হ'বে, তখন নাইট্রিক-এ্যাসিডের ব্যবহার অপরিহার্য; এবং সব চেয়ে অল্প খরচে এবং বহুল পরিমাণে নাইট্রিক-এ্যাসিডের উৎপাদনের এ-টাই প্রেষ্ঠ প্রণালী এবং সর্বশেষ ও প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, এ প্রণালীতে কিছুই নষ্ট হ'তে পারে না—এমন কি এ্যামোনিয়ম-সলফেট প্রস্তুতের সময় ক্যালসিয়ম কার্বনেট ($CaCo_3$) নামে একরকম পদার্থ গর্ভে থাকে; তা'কেও আবার অনায়াসে সিমেন্ট তৈরীর কাজে লাগান যে'তে পারে।

এদিকে আবার মাটিতে এ্যামোনিয়ম-নাইট্রের ব্যবহার নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে তর্ক-বিতর্কের মহড়া চ'লেছে। কারণ এ জিনিষটি সহজেই বিস্ফোরণ ঘটায়। এ'র একটা সাধারণ ধর্ম হচ্ছে যে, বাইরে বাতাসে রেখে দিলে সহজেই বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে দলা পাকিয়ে যায়। কাজেই কৃষকরা যখন একে আঘাত দিয়ে গুড়ো কর'বার চেষ্টা করবে তখনই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কিন্তু সাধারণত এর জন্য ২০০° ডিগ্রী থেকে ৩০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপের দরকার। আবার পরীক্ষা করে এও দেখা গেছে যে, এ্যামোনিয়ম-সলফেট ও এ্যামোনিয়ম-নাইট্রেট যদি আধা-আধি ভাগ করে মিশিয়ে জমিতে দেওয়া যায় তবে আর বিস্ফোরণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ এর ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের যথাযথ নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা করেছেন এবং তা'র ফলও খুব আশাতরূপ পেয়েছেন। কাজেই আমাদের দেশে ঐ ব্যবস্থায় শতকরা ৫০% ভাগ এ্যামোনিয়ম-নাইট্রেট ব্যবহার করে আমরা এ বিষয়ে শতকরা ৫০% ভাগ স্বাবলম্বী হতে পারি।

আর একরকম সার আছে ফসফেট, কিন্তু এর কথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। নাইট্রোজেন-সম্বন্ধীয় সার নিয়েই আমরা ব্যস্ত। ১৯৩৯ সালে পৃথিবীতে মোট ফসফেট খরচ হয় ১৮০ লক্ষ টন, অর্থাৎ এ্যামোনিয়ম সলফেটের প্রায় দ্বিগুণ। সেই তুলনায় ভারতে ফসফেট ব্যবহারের পরিমাণ অতি নগন্য—মাত্র ১২,০০০ টন; কিন্তু এদিকে উন্নতি করবার প্রচুর সুবিধা ভারতের আছে। যে একমাত্র কাঁচামাল ক্যালসিয়ম্-ফসফেট, তা' বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় ত্রিচীতে ও বিহারের সিংহভূমে। বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে এ বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার বস্তুত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরা কিন্তু সুপার ফসফেট [$CaH_4 Ca So^4$] দিকে তত নজর দেবেন না, কারণ তা'র জন্য সলফিউরিক এ্যাসিডের প্রয়োজন। এই এ্যাসিডের জন্য আবার বিদেশের দিকে চেয়ে থাকতে হ'বে এবং খরচও

পড়বে অনেক বেশী। কিন্তু এঁরা যে-প্রণালীতে কাজ চালাবেন, তা'তে বাজারে প্রতি টনের দাম পড়বে ৫৫৲ টাকা। তাদেরই এদিকে কর্তৃপক্ষের নজর আবশ্যক।

এ-পর্যন্ত যা' আলোচনা হ'ল—তা'র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভবিষ্যত ভারতে এ-সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে। কিন্তু এ আলোচনার কতখানি অংশ বাস্তবরূপ গ্রহণ ক'রবে, তা' নির্ভর ক'রছে দেশের গবর্ণমেন্টের উপর। এ-পরিকল্পনাকে শুধু পরিণতি দিতে পারে একমাত্র সেই গবর্ণমেন্ট—যা'র সংগে দেশের লোকের নাড়ীর সম্পর্ক আছে, যাকে বলতে পারি ভারতের জাতীয় গবর্ণমেন্ট।

ছোট্ট খোকন্

সৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

বাড়ীর মধ্যে সকলের ছোট। ফুট্‌ফুটে গায়ের রঙ, নাদুস্ নুদুস্ গড়ন, চাঁদপানা মুখ, তার মাঝে একজোড়া কালো চোখ পিট্-পিট্ করছে। দেখলেই মনে হয় এক নম্বরের দুষ্টু আর ডানপিটে। মাথায় এক বোঝা কটা শনের দড়ীর মত চুল, এ' নিয়ে দিদিরা কতই না ঠাট্টা করে; বলে, 'কালকেই নিগুকে দিয়ে খোকনের চকচকে রঙিন চুলগুলো ফ্যাসানমত কাটিয়ে দেওয়া হবে। অমন চুলের যত্ন নেয়া দরকার।' খোকনের বোধ হয় অভিমান হয়, দুষ্টু চাহনি পলকের মধ্যে বদলিয়ে যায়। কালো চোখ দু'টো এক অব্যক্ত বেদনায় ছল্‌ছল্ করে ওঠে। হাতের বুড়ো আঙুলটা মুখের ভিতর দিয়ে চুষতে থাকে, দৃষ্টি থাকে দিদিদের ওপর। তার মাঝে কতই না কাতরতা! দিদিরা হেসে ওঠেন, খোকন লজ্জায় দিশেহারা হয়ে মুখ রাঙা করে মার কোলে গিয়ে লুকায়।

মা তখন বসে পান সাজছিলেন। খোকনের অমন আকস্মিক আগমনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে খোকন, কি হোল তোর? উনি বুঝি বকেছেন? না' তুই দুষ্টু হ'য়েছিস্।' খোকন তখন দিদিদের কথা ভাবছে, দিদিরা কেবল তাকে জ্বালাতন করে, দিদিদের অত বন্ধুর সামনে কেমন করলে ওরা। তার চুল এমন কি খারাপ। এত ঠাট্টা কেন?....সেদিনও সুধী কি বলছিল—'আহা, দাদাবাবুর কি সুন্দর চুলগুলো, যেন একরাশ নরম পেঁজা তুলো!' মা আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'বল্ না খোকন, কি হোল তোর? অমন করে ছুটে এলি কেন?'—কিছুক্ষণ পরে খোকন হঠাৎ মুখ তুলে মাকে শুধায়, 'হাঁ'মা আমার চুল নাকি খুব খারাপ, দিদিরা বল্লে'—মা খোকনের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকেন, তারপর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, 'নারে ওরা তোকে অমনি ঠাট্টা করে।' মা বিরক্ত হন, বলেন,—'কতদিন ও'দের বারণ করেছি তোর সংগে অমন ক'রতে তবুও যদি বুড়ো মেয়েদের আক্কেল থাকে!' মা আপন মনে ব'কে চলেছেন; কিন্তু তিনি যদি একটু চোখ ফেরাতেন ত দেখতেন, তার খোকন কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

সে দিন সকাল বেলা। দিদিরা বসে স্কুল কলেজের পড়া করছিল। খোকন সেখান দিয়ে ভুলোর বাচ্চাদের সাথে খেলা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে দেখে বড়দি বলেন, 'খোকন বইখানা মাটিতে পড়ে গেল, তুলে দে'না লক্ষ্মী ভাইটি।' খোকন শুনেও শোনে না। মুখ ঘুরিয়ে বুক ফুলিয়ে গম্ভীর ভাবে বাইরের মাঠে চলে যায়। দিদিরা তার রকম দেখে মুচ্‌কি হাসেন।

আজ খোকনের জন্মদিন। সকাল থেকেই সুরু হয়েছে উৎসবের সমারোহ। লোকজনের চীৎকারে আর চাকর বাকরদের হাঁকডাকে বাড়ী সরগরম হয়ে ওঠে। দিদিরা কতরকম শাড়ী পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধুদের সাথে কত গল্পগুজব করছে। ওদিকে বাড়ীর গেটের সামনে 'তুলো' কুকুরটা তার বাচ্চাদের নিয়ে মহা চীৎকার শুরু করে দিয়েছে। এত লোকজনের আগমনে তারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আজ আর খোকনের আদরের সীমা নেই। সকলেই তাকে নিয়ে আনন্দে মত্ত। মা সোনার খোকনকে কোলে করে স্নান করিয়ে দেন্। বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন্। কত আদর! কত যত্ন! ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসে। সানায়ের মন-মাতানো সুরে চারিধার মুখরিত হয়ে ওঠে। আত্মীয় পরিজনের সমাগমে সারা বাড়ী ভরে যায়। দিদিরা কত ডাকেন, 'অ,' খোকন কোলে আয় ভাই'—খোকন কিন্তু নিশ্চল পাথরের মত গম্ভীর ভাবে বসে থাকে। একটীও কথা কয় না। দিদিরা কত ঠাট্টা করে। খোকন রাগে ফুলতে থাকে। এমন সময় বড়দি দৌড়ে খোকনকে কোলে তুলে নেন; বলেন, 'ওমা! তুই কি যেমেছিস খোকন! চল তোকে মুছিয়ে দিইগে'—দিদি তাকে বন্ধুদের কাছে নিয়ে যান। কতলোকজন খোকনের দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় দিদি বলেন, 'এই আমার ছোটভাই খোকন, যার আজ জন্মদিন'—দিদিদের বন্ধুদের মাঝ হতে, একজন এসে খোকনের গলায় কি একটা চকচকে জিনিষ পরিয়ে দেন! দিদি বলেন—'দেখছিস্ রেনু, খোকনের কি চমৎকার চুল গুলো, সত্যিই ভালো নয় রে?···আর চোখ দুটো যেন'—বলে দিদি খোকনের গাল দু'টো টিপে দেন অপরিমিত আবেগে। গভীর লজ্জায় আর আনন্দে খোকন দিদির বুকে মুখ লুকায় আর তার সাথে সাথে শেষ হয়ে আসে সকল অভিমান সকল বিদ্বেষ। উৎসবের কোলাহলের মাঝে সানায়ের রাগিণী যেন আরও স্পষ্টই হ'য়ে ওঠে।····

অবসান

শোভা ঘোষ

(প্রাক্তন ছাত্রী)

মাস দু'তিনেক আগের কথা বলছি। একদিন সকালে না খেয়েই কাজে গিয়েছিলাম। কাজের তাড়ে খাবার কথা মনেও হয়নি। দু'টোর সময় একটু অবসর পেতেই উদর জানিয়ে দিলে—আজ আমার কিছু খাওয়া হয়নি। কী করি! রেস্তোরাঁ ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখলাম না—অবশেষে অতি সংকোচে তাতেই ঢুকে পড়লাম। কাছে পয়সাও বেশী নেই—সামান্য কিছুর সংগে চায়ের অর্ডার দিলাম।

চায়ের কাপে হাত দিয়েছি এমন সময় একটি লোক ঢুকলো। রেস্তোরাঁতে লোকতো কতই ঢোকে—তাদের সকলকে ক'জনই বা লক্ষ্য করে। কিন্তু আগন্তুকটির মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্যে তার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে পারা যায় না। লোকটি অত্যন্ত রোগা, লম্বা দীর্ঘাকৃতি, মুখের উপর নাকটি যেন খড়্গের মত উঁচু হয়ে রয়েছে আর ছোট্ট চোখ দু'টিতে যেন কিসের আগুন জ্বলছে। পরণে একখানি ময়লা কাল চওড়া পাড়ের কণ্ট্রোলের ধুতি—একটা শতচ্ছিন্ন মলিন পাঞ্জাবী আর পায়ে একজোড়া কেড্স্, তাও ছেঁড়া ও বিবর্ণ। মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল সামনে মুখের ওপর এসে পড়েছে। ঢুকেই সে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েই

কতকগুলো দামী দামী খাবারের আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলে। আমি তার দিকে প্রথম থেকেই হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে সে আমার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে। আমি অপ্রতিভ হ'য়ে মুখ নীচু করতেই শুনলাম লোকটি খিল খিল করে হেসে উঠল। অবাক হ'য়ে আবার তার দিকে তাকালাম কিন্তু ততক্ষণে দেখি তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে—যেদিক থেকে 'বয়' আহার্য নিয়ে আসে সেইদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে—সমস্ত মুখখানিতে তার কেমন যেন একটা বেদনার ছায়া পড়েছে।

যথাসময় খাবার এসে পৌছল। সজ্জিত থালাটিকে সে সাগ্রহে দু'হাতে ধরে নিয়ে তার ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়ল—আর আনন্দে পা দু'টো দোলাতে লাগল। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার মশাই এই ঘরেরই এক কোণে একখানি চেয়ারে বসে আহার প্রার্থীদের তদারক করে থাকেন—নজর রাখেন। তার দিকে চেয়ে দেখলাম—তিনিও দেখি অন্য সমস্ত অতিথিদের ত্যাগ করে—এই নবীন আগন্তুকটির দিকে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রয়েছেন। লোকটি যেই একখানি খাবারে হাত দিয়েছে—অমনি এঁর কণ্ঠ থেকে শোনা গেল—

'ও মশাই, প্লেটেতো হাত দিচ্ছেন—বলি, পয়সা এনেছেন ?"

নবীন আগন্তুক চমকে খাবারের থালাটিকে আরও আঁকড়িয়ে ধরে মুখ তুলে চাইলে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি'—ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। দেখলাম লোকটির সমস্ত মুখখানি একেবারে শাদা হয়ে গেছে—চোখের দীপ্তি যেন দপ্ করে নিভেছে—সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আর বিশ্বের কাতরতা দিয়ে কম্পিত হাতে প্লেটটিকে আরও বুকের কাছে টেনে এনেছে।

ব্যবসায়ী ম্যানেজার সমস্ত ব্যাপারটিকে মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেললেন। ভ্রূ কুঁচকে, দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা টেনে ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন—

'ট্যাকে আধ্‌লা নেই—বাবুর আবার খাবার সখ হয়েছে। পেটের রাক্ষুসে ক্ষিদের আগুন—যান্ যান্ ঐ টিউব-ওয়েল পাম্প করে নিবোন গিয়ে। ওরে—এই ভজা—প্লেট তুলে নিয়ে যা।"

ভজা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—চোখ টিপে দাঁত টিপে হেসে হাতটা একটু কচ্‌লিয়ে নিয়ে প্লেটটিতে টান দিয়ে বললে—

'ছাড়ুন বাবু মসা। আর মায়া বাড়িয়ে লাভটা কী আছে! ছি-ছি-ছি.....।' প্লেটটি তুলে নিয়ে গেল। লোকটির হাত দু'টি যেন পুষ্পচ্যুত বৃন্তের মত টেবলের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ভজার গমন পথের দিকে সে ভাবাহীন দৃষ্টিতে অপলক চেয়ে রইলো।.....

ভজা অদৃশ্য হতেই তার চেতনা ফিরে এলো। ঘরের সমস্ত লোক যে তার দিকে চেয়ে উপহাসের হাসি হাসছে। সে কিন্তু তা দেখেও দেখলে না। শুধু বিদ্যুৎবেগে তার স্খলিত হাত দু'টো দিয়ে চায়ের প্লেটের দু'ধার চেপে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে ম্যানেজারকে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলে—'এটাও কী নিয়ে যাবে?' ম্যানেজার এর কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে এগোতে লাগলেন। নবীন আগন্তুকটির দৃষ্টি যেন জ্বলে উঠল। সে টপ করে চায়ের গরম কাপটিকে মুখে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা জলের মত চক্‌চক্ করে এক চুমুকে খেয়ে ফেল্‌লে। আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলাম—'কী করছেন গলা যে পুড়ে যাবে?"

'পেটের জ্বালা গরম জলের জ্বালা দিয়ে নিবিয়ে দিলুম—ব্যস!'—বলেই কাপটিকে ছুঁড়ে ম্যানেজারের দিকে ফেলে দিয়ে সে একেবারে রাস্তার ওপরে এসে পড়ল।

ঘরের আর সমস্ত লোকের সংগে ম্যানেজারও যেন কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন—তিনি একবার লোকটি যেদিকে পালানো সেইদিকে—আর একবার পায়ের কাছে ভাংগা কাপটার দিকে তাকাতে লাগলেন। অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন বলে উঠল—'ইস্, আর

ASUTOSH COLLEGE
INTER COLLEGIATE MUSIC COMPETITORS
1945

Sitting (from left)—Asim Bhattacharya, Prof. D. B. Sinha, Vice-Principal S. Mukherji, Principal P. Sinha, Vice-Principal K. Sen, Ranen Bose, Gorachand Kundu.

Standing (from left)—Kalyan Chakrabarty, Arati Sarma, Tripti Choudhury, Namita Biswas, Gita Roy, Arati Dass, Hena Burman, Kamala Deb Sikdar, Ira Choudhury, Santi Halder.

একটু হ'লে আপনার চোখটা কানা হয়ে যেত। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দৌড়ে ধরুন লোকটাকে।'

ম্যানেজারের চমক্ ভাঙ্ল—তিনি ছুটলেন। আমরাও কয়েকজন মজা দেখবার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি সেই লোকটি বেশ নির্বিবাদে ফুটপাথের ওপরের এক পানের দোকানে দড়ির আগুণ দিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। হঠাৎ 'ধর ধর' শব্দে সচকিত হয়ে চাইতে যেই দেখল ম্যানেজার তার দিকেই ছুটে আসছে অমনি সে পলকের মধ্যে রাস্তায় নেমে পড়ল ……সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ভয়ে উঠ্‌ল 'গেল গেল' শব্দে। নিমেষের মধ্যে কী হয়ে গেল বুঝতে না পেরে আমি ভাল করে চোখ মেলে তাকালাম—দেখি বিরাট একখানা লরী দাঁড়িয়ে রয়েছে—আর কয়েকজন লোক মিলে কাকে যেন টেনে টেনে বার করছে। মিনিট কয়েক পরেই ফুটপাথের ওপর কাকে এনে শোয়ালো?—এ যে রেস্তোর্াঁর সেই নবীন আগন্তুক!

কাছে গেলাম—রক্তে তার সমস্ত মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন বললে—'হাসপাতালে নিয়ে যাও হে।' যারা তাকে ধরেছিলেন তাঁদের একজন বললেন—'আর হাসপাতালে যেতে হবে না……খাটিয়া আনো হে, সব শেষ হয়ে গেছে।'

"হ'তেই হবে বাবা। ট্যাকে পয়সা না নিয়ে যারা খেতে যায় তাদের বরাতে কিদের অবসান এমনি অপঘাতে মরেই হয়। কী বলিস ভজা?" ম্যানেজার বিজ্ঞের মত সিদ্ধান্ত করলেন।

ভজা এক গাল হেসে বললে—'তা যা বলেছেন—বাবু সাব!'

আশুতোষের বাণী

জীবনের যে কোন আবেষ্টনেই তোমাদের ভাগ্য জড়িয়ে পড়ুক না কেন, নিজকে বিদ্যায়তনের যথার্থ শিক্ষার্থীরূপে প্রমাণ করো।……জ্ঞান ও ধর্মের প্রসারই তোমাদের জীবনের ব্রত হোক, তোমাদের ব্রত হোক্ অজ্ঞান ও অশুভের উচ্ছেদ-সাধন। সবার ওপরে, চারিত্রিক স্থৈর্যের জন্যে সাধনা করো; গড়ে তুলো আত্মসম্মানের সেই আদর্শ—যা' একবার নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। বিস্মৃত হ'য়ো না—যদি সম্মানিত মানুষ না হয়ে উঠ্‌তে পারো—তবে প্রতিভাই বলো, শিক্ষাই বলো, আর শ্রমই বলো, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে; তোমাদের বুদ্ধিমত্তা তোমাদের নিজকেই প্রতারণা করবে, মিথ্যা হয়ে যাবে অন্য দশজনের কাছে। যে মানসিক তেজ কৃষ্টি ও জ্ঞানের সত্যিকারের পরিচায়ক—যার দীপ্তিহীনতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্বাভাবিকভাবে অনুভব করে থাকে—তাকে বাড়িয়ে তোল, উদ্দীপ্ত করো।

(অনুবাদক : জীবেন্দ্র সিংহ রায়)

কবিতা

'রূপকথা'

অসীম ভট্টাচার্য
চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

মন্থর পায়ে মাগিছে বিদায় রাত্রি-শেষ,—
পাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিমাকাশে অস্তমান ;
স্তিমিত তারার কম্পিত চোখে বিদায়-রেশ,
নিশিগন্ধার পূজা-উপচার শিথিল, ম্লান ।

আকাশে কেবল ধ্রুবতারা জাগে নিষ্পলক,
নিশা-জাগরণ-ক্লান্তি এখনো লাগে নি তা'র ;
ধরণীর বুকে আলোছায়া রচে স্বপ্নলোক,
সুপ্ত কুসুমে গুমরিয়া মরে গন্ধভার ।

যূথীবন হ'তে সজল পবন বহে উদাস,
কেতকীর বনে ঝিল্লী ক্বণিছে ক্লান্ত সুর ;
পাখীর ডানায় আলোক জাগায় নবোচ্ছ্বাস,
ভোরের পসারী গান গেয়ে যায় কোন্ সুদূর !

পাষাণপুরীতে জাগে নাকো সাড়া ঘুম-ভাঙার,
রাজকন্যার নয়নে এখনো স্বপ্ন ছায় ;—
মর্মরি' ওঠে ব্যাকুল বাতাস, পরশে তা'র,
ঘৃত-প্রদীপের নিস্তেজ শিখা কাঁপিয়া যায় ।

সোনার কাঠির পরশ এনেছে নীরব ঘুম,
শত সংশয় শান্তি লভেছে নীরবতায়—
কল্পনা আঁকে পাষাণ নয়নে আশার চুম,
বাস্তবতার দৃঢ় আবরণ টুটিয়া যায় !

তাহারে জাগা'তে রাজার কুমার ছেড়েছে ঘর,
অজানা দেশায় পথ খুঁজে ফেরে রাত্রিদিন :
পথের বাঁধনে জড়ালো যে তারে তেপান্তর,
ক্লান্ত নয়ন জাগে বুঝি তাই তন্দ্রাহীন !

পক্ষীরাজের অবশ চরণে ঘুম জড়ায়,
দূর রয়ে যায় রহস্যভরা চির-সুদূর,—
তবু শেষ নাই সুদূরের দূর-পথ-ধরায়
ছিন্ন-বীণায় রহি' রহি' বাজে আশার সুর !

বেলা-শেষের গান

মীরেন্দ্রনাথ সেন

প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

তোমার কাছে জানিয়ে নমস্কার
বিদায় আমি নিলেম হাটের পথে
তখন আমি জেনেছিলেম সার
তোমার সাথে ফিরব তোমার রথে।
চলছে সেথায় কতোই বেচাকেনা
জমিয়ে ক্রমে নিলেম লক্ষ দেনা,
পথে পথে পাওনাদারের দেখা—
পালিয়ে আসা ভার।—
তোমার সাথে ফিরব তোমার রথে
তখন আমি জেনেছিলেম সার।

ঘুরে ঘুরে অনেক হ'ল দেরী
তোমার সাথে তাই হ'ল না দেখা।
এমন সময় দূর গগনে হেরি
মেঘে ঢাকা তোমার রথ-রেখা।
কত না পথ এলেম আমি চলে
কাঁধে আমার হাটের বোঝা দোলে॥
পথের মাঝে ধূলায় অকারণে
আর হবে না দেরী।
মেঘে ঢাকা তোমার রথ-রেখা
এমন সময় দূর গগনে হেরি॥

স্বাধীনতা দিবস

দীপক রায়

দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

বলদৃপ্ত সাধনায় দীক্ষা পা'ক তব মর্ম বাণি :
দ্বেষ হিংসা অন্তরের গ্লানি
তোমার চিন্তার ক্ষেত্রে পায় যেন লয়
সুনিশ্চয়।
তুচ্ছ করি মিথ্যা অভিনয়
তুচ্ছ করি জীবনের সর্ববিধ দুঃখ মৃত্যু ভয়—
জয়োদীপ্ত অভিসারে শিখে লব বন্দনার গান,
আহরিব সুন্দরের দান।
যা' শ্রেয়, যা' শিবপ্রিয়, প্রাণপাত্রে লব তাহা ভরি
সাধনার সমরে উত্তরি'।
জয় হোক, হোক তব জয়—
তুচ্ছ করি দুঃখ মৃত্যু ভয়।

আলোর পিয়াসী

পশুপতি ঘোষাল
চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

আজ ছোট হ'য়ে গেছে উদার অনন্ত আকাশ,—
বন্দী হয়েছে বাতাস, যন্ত্রের কারাগারে।
তবু কী মোহে যে বসন্ত নেমে আসে
বনে ফুল জাগায়, যৌবনে আনে চঞ্চলতা!
আজ শতাব্দীর যন্ত্রাগারে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে
কলে পড়া ইঁদুরের মত
মরে গেছে ভগবান, প্রেমের ভগবান।

কিন্তু জানো কি—
তার মরা চোখের অভিশাপ-বহ্নি
ঝরতে সুরু করে আণবিক বোমা হ'য়ে?
আঁধার রাত্রের বক্ষ দলন করে'
প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত—
মানবের তৈরী যন্ত্রগুলো
মানবের লাল রক্তের মোহে ছোটে।
মানবের তৈরী মসৃণ সহরের বুকে
এখনও নাকি মেলে রুক্ষ হাড়ের সমষ্টি।

সভ্যতার ছদ্মবেশ গেছে খুলে—
মায়ার স্বপ্নাঞ্জন হয়েছে নিশ্চিহ্ন;
পরিপূর্ণ নিটোল যৌবন
কুশ্রিতার অশ্লীল বাতাসে হয় চঞ্চল।

পৃথিবীরও হয়েছে অনেক বদল—
যেখানে ছিল মাঠ
সেখানে আজ লোহিত সাগরের কলরোল!
তবু রাত্রিশেষে হয়ত দেখা যায়
পূব আকাশের সেই আলোর রেখা.....
অন্ধকারের আলোক পারে আজও তাই চেয়ে আছি
ভোরের পাখী যদি কখনও হঠাৎ গেয়ে ওঠে।

'আজিও সে ডাকে মোরে'

শ্রুতীশকুমার চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

মালঞ্চের ঝরা ফুলে,
স্মৃতির সৌরভ আজো আসে।
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে॥

আজিও নদীর কূলে
ফোটে ফুল—ঝরে পড়ে যায়,
পাখী গায়—আঁধার ঘনায়।

আজিও তরুর শিরে
ওঠে চাঁদ—মৃদু মধু হাসে,
আজিও সে মোরে ভালবাসে।

আজিও পূর্ণিমা-রাতে
ডাকে পাখী,—পিক কুহরায়—
ফুল ধরে মালতী লতায়।

আজিও গভীর রাতে
যবে মোর ঘুম ভেঙে যায়,
কেন তারে মনে পড়ে হায়।

সে কিগো গিয়াছে চলে,
সে কি আর নাই ধরিতে?
সে কি আজ মিশেছে ধূলিতে?

আজিও শেফালি তলে
সে ঘুমায়,—ফুল ঝরে পড়ে
শুভ্র তার সমাধির পরে।

আজিও সে ডাকে মোরে
যে-সুরে ডাকিত মোরে ধীরে,
আমি তাই বসি নদী তীরে।

সে কিগো মরিতে পারে?
এখনো সে ওখানে ঘুমায়—
জ্যোৎস্না আসে, হাসে, গান গায়।

রিক্সাওয়ালা

সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য

503

সবে তো সকাল, কাঁচা রোদ্দুরে ভরা,
এখনি রাস্তা ভরেছে ট্রামে ও বাসে,
মোটর ট্রাকের ছুটোছুটি হ'লো শুরু
দুর্ঘটনার ভয়ে ভরা রাজপথে।
এরই মাঝখানে ছুটে চলে প্রাণপণে
রিক্সাওয়ালা, আরোহী-বোঝাই আপন রিক্সা টেনে
হুঁসিয়ার চোখ—কখন বা কোন মিলিটারি ট্রাক লেগে'
গুঁড়ো হ'য়ে যায় ক্ষুদ্র-সে যানখানা—
বজ্রের ঘায়ে বৃত্রাসুরের রথ-রথটার মতো।

বেলা বেড়ে চলে, আর
নৃত পথখানা চঞ্চল যেন হ'য়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে।
কেরাণির ভারে মন্থরগতি দোতলা বাসের দল
টলমল ক'রে চলে মাতালের মতো।
ছুটেছে ট্যাক্সি, ছুটেছে ঘোড়ার গাড়ী
বিশ্রামহীন সৈন্য বোঝাই লরী
একঘেঁয়ে ট্রাম চলে—
ছুটন্ত বাসে হঠাৎ সজোরে ড্রাইভার ব্রেক কসে
দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে ছুটে চলে রিক্সাটা।

মাথার উপরে উঠেছে আগুন, পিচের রাস্তা গলে,
জন-সমুদ্র চলেছে ভাঁটার টানে
ট্রামের আওয়াজে ক্লান্ত দুপুর মাঝে মাঝে দেয় সাড়া,
স্তব্ধ, দগ্ধ, নির্জন রাজপথ।
রাস্তার মোড়ে লালপাগড়ীর কিমনো হয়েছে শুরু।
একাকী রিক্সা চলে মন্থরগতি
শব্দিত হয় ক্ষুদ্র ঘণ্টা থেকে থেকে মিঠে রবে;
শ্রান্ত, ক্লান্ত রিক্সাওয়ালা চলে—
গলিত পিচ সে দলিত হয়েও পাছুটোকে টেনে ধরে,
ঘর্মের ধারা দর দর ধারে ছুটেছে সারাটা দেহে,
পাকস্থলীতে জ্বলে রাবণের চিতা।

স্তব্ধ নিশুতি রাত—চঞ্চল শিশু ঘুমায় মায়ের বুকে,
আঁধারের কোলে স্তব্ধ সহর মগ্ন গভীর ঘুমে
সারাটা দিনের চঞ্চলতার পরে।
গির্জা ঘড়িতে সবকটা বেজে গেছে।
রাস্তার আলো নিভে গেছে সব, এক ফালি চাঁদ শুধু
শিরীষের ডালে মাঝে মাঝে উঁকি মারে।
গভীর রাতের স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে
শব্দিত হয় ঠুন্ ঠুন্ রবে ঘণ্টা বিলম্বিত।
রিক্সার আলো জ্বলে জোনাকির মতো।
রিক্সাওয়ালা চলে—
অবশ পাছুটো টেনে নিয়ে শেষে আপন ঘরের মুখে
সারাটা দিনের হাড়ভাঙা কাজ সেরে।
কতোই যে ঘোরা হ'লো সারাদিন ধরে
কতো বড় পথ, ছোট গলি, কতো জানা ও অজানা পথে
খালি ও বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে দ্রুত ও মন্দপদে
কত চাওয়া পাওয়া সারা দিনমান ধরে!
পয়সার চেয়ে অপমানই তার প্রাপ্য হয়েছে বেশী,
কত তরুণের রক্তিম চোখ, বাবুদের গালাগালি,
তরুণীদলের কুঞ্চিত নাসা, পুলিশ-কুলের গুঁতো
সাহেব-মেমের ধমকানো,—হায়
কত ছবি আহা, কত ছবি ভাসে মনের গহন মাঝে।
ভাবে আর চলে রিক্সাওয়ালা। দিনের অভিজ্ঞতা
ধিক্কার আনে হীন জীবনের 'পরে।
একটানা এই পশু-জীবনের কবে অবসান হবে?
নিঝুম চতুর্দিক।
মাতাল গোরার বুটের শব্দ মাঝে মাঝে আসে ভেসে,
রিক্সা চলেছে দূরে—
লাল আলোতার মিশে গেলো ক্রমে গাঢ় আঁধারের বুকে
ঘণ্টার ধ্বনি মিলালো বাতাস মাঝে
রিক্সাওয়ালা গেলো কি শান্তি-নীড়ে?

আলাপ-আলোচনা

বর্তমান বাঙ্‌লা ও বাঙালী মেয়ে :

আধুনিক বাঙলা ও বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করিলে মন্দ হয় না। যদি ইহাতে কিছু ত্রুটি থাকে, ত্রুটি থাকিবেই, সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই, বিরুদ্ধবাদিনীদের মার্জনা ভিক্ষা করিয়া লই।

আমাদের দেশে, শত বৎসর পূর্বে, বাঙালী মেয়েরা পর্দানশীন ছিলেন এবং পর্দার প্রথা পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না। মোগল ও পাঠান যখন আমাদের দেশে রাজত্ব করেন তখনই তাহাদের অত্যাচারের ফলে মেয়েদের পর্দানশীন হইতে হইয়াছিল এখন যদিও বেশীর ভাগ মেয়েরা পর্দানশীন নহে তথাপি নিয়মটি একেবারে উঠিয়া যায় নাই। শত বৎসরাধিক পূর্বে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর অবস্থা এরূপ ছিল না। প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছু না কিছু জমি-জায়গা ছিল এবং তাহারা খুব সরলভাবে শান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিত। বাবা মা অতি অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহাদি দিতেন এবং যতদিন ছেলেমেয়েরা সক্ষম না হইত, ততদিন তাহারাই প্রতিপালন করিতেন। ছেলেরা উপযুক্ত হইলে নিজেদের কাজকর্ম দেখিত।

আজকাল ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়িতেছে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় লেখাপড়া শিখিতেছে। কিন্তু তাহারা পুঁথিগত বিদ্যাই শিখিতেছে। শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি—শিক্ষা কাহাকে বলে? যাহাতে আমাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হয় তাহাকেই আমরা শিক্ষা বলি। শিক্ষা বলিতে শুধু লেখাপড়া বুঝায় না গৃহস্থালীর কাজকর্ম ও সাংসারিক কাজ-কর্মে ও আর্থিক কার্যে সাহায্য করিতে শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা প্রভৃতি দিয়া এবিষয়ে সাহায্য করা—সকলই বুঝায়। আজকাল কলিকাতা মহানগরীর পথে-ঘাটে-ট্রামে বাসে সর্বত্রই সুন্দরী, কুৎসিত কত মেয়ে কত বিচিত্র বেশভূষায় কেহ বা কাযে কেহ বা অকাজে ঘুরে বেড়ায়। কলিকাতা সহরে এখন ষ্টাইলের হাওয়া; এমন কি ছোট ছোট গ্রামেও এই হাওয়া বহিয়াছে। এদিকে কিন্তু মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল বলা চলে না। তার উপর আবার যুদ্ধের বাজার, মানুষে চাল, ডাল, নুন, তেল, কাপড় করিয়া হাহাকার করিতেছে। ইহার মধ্যেও ষ্টাইল্ কিছু কমিতেছে না। যাহারা বড় লোকের মেয়ে বা বধূ তাহারা সেভাবে চলিতে পারে; কিন্তু আমরা বেশীর ভাগ সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এবং আমাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া চলিতে হইবে। আমরা প্রত্যহ কোথায় নূতন শাড়ি এবং ব্লাউস, জুতা, কানের দুল প্রভৃতি পাইব? আজকাল ম্যাচ্ করিবার জন্য সস্তার পুঁথি-দুল কানের দুল ও কাঁচের চুড়ি হইয়াছে। আমার মনে হয় নিজেদের উন্নত করিতে হইলে শিক্ষাকালীন সময় এ-সকল বাদ দিতে হয়। মেয়েরা স্কুল কলেজে যায় সাজিয়া গুজিয়া, যেন তাহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে স্কুল কলেজে লেখা পড়া করিতে আসিয়াছে; এবং এখানে সাদাসিদা-ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিলেই চলে। আবার স্কুল কলেজে পড়ে বলিয়া তাহারা বাড়ীর কোন সাংসারিক কাজ করিতে চায় না এবং উহা ভদ্রঘরের মেয়ের করা উচিত নয় মনে করে। ঘরের কাজের জন্য ঝি, চাকর, বামুন থাকিবে। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের গৃহস্থালীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজ করিতে হইবে। আমি যে মেয়েদের বলিয়া বহুবচন ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে আমি বাংলাদেশের সমস্ত মেয়েদের বুঝাইতেছি, তাহা নয়; তবে শতকরা সহরবাসী মেয়েদের মধ্যে নব্বই জন আমার উল্লিখিত মেয়েদের মধ্যে গণ্য।

ইহা ব্যতীত মেয়েদের লেখাপড়া শেখান হয় যেন তাহাদের বিবাহের জন্য। ইহা অভিভাবকগণও বুঝেন

এবং মেয়েরাও বুঝে। সেইজন্য বিবাহের পরে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা কমিয়া যায় এবং অভিভাবকেরাও বলেন আর পড়িয়া কি হইবে! বিবাহ হইয়া গিয়াছে এখন সংসার-ধর্ম পালন কর। মেয়েরা যাওবা কিছু শিখিয়া থাকে তাহাও বিনা চর্চায় নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত আমাদের সামাজিক বিষয়েও কিছু বাধা আছে।

বিবাহ দেওয়া বা বিবাহ করা খুবই ভাল কথা কিন্তু বিবাহ যে সকলকেই করিতেই হইবে এবং বিবাহের পরে জীবনের বৃহত্তর কর্মের সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া খাওয়া-দাওয়া ও সাংসারিক কাজকর্ম লইয়া দিন কাটাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমার মনে হয়, আমরা যদি সকলে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যগত রীতি অনুযায়ী নৈতিক ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা উন্নতি করিতে পারিব। চল্লিশ বৎসর পূর্বে জাপানি মেয়েদের অবস্থা আমাদের দেশের মেয়েদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল এবং আজ সে দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে আগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের জাপানিত্ব ত্যাগ করে নাই। তাহারা যখন যে-দেশ হইতে যাহা পাইয়াছে তাহার ভাল অংশটুকু গ্রহণ করিয়াছে। আজ আমি সকলকে অনুরোধ করি যে, তোমাদের জীবনে যে-দোষত্রুটি আছে তাহা সংশোধন করিয়া লইয়া যখন যে অবস্থায় যে কোন দেশ হইতে যে কোন জাতির নিকট হইতে যাহা কিছু ভাল, শ্রেয় এবং সুন্দর তাহা গ্রহণ কর। প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভালমন্দ কিছুনা-কিছু আছে। কেহ একেবারে ভাল কেহ একেবারে মন্দ, নয়। ভালমন্দ মিশিয়া মানব-সমাজ সৃষ্টি হইয়াছে।

ভালকে ভালো বলিয়া গ্রহণ করিবার এবং মন্দকে মন্দ বলিয়া পরিহার করিবার যোগ্যতা অর্জন-ই আধুনিক জাতিজীবনের সুচারু তপস্যা। এই তপস্যার মধ্য দিয়াই জাতি অসৎ হইতে সতের পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই তপস্যা আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ হউক।

রেণুকা সেন—দ্বিতীয় বর্ষ

শিক্ষার অধোগতি :

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব পরীক্ষার ফলই আশাতীত খারাপ হয়েছে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কলা বিভাগে ২৯% ও বিজ্ঞানে মাত্র ৩৫% ছেলে উত্তীর্ণ হয়েছে, দেশের সর্বত্রই একটা হতাশার ভাব এসেছে—সর্বত্রই বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে আর এ' নিয়ে শোনা যাচ্ছে অসুট গুঞ্জন আর আলোচনা। শিক্ষায়-দীক্ষায় যে বাঙ্গালী সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, সেই বাঙ্গালীর এই শোচনীয় পরিণতি সত্যই কষ্টকর ও বেদনাদায়ক।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিব্রত হ'য়ে উঠেছেন—কিন্তু সেই পক্ষের থেকে কোনই সমাধান মেলেনি! নানা মুনির নানা মত। কারুর মতে এইরূপ অধোগতির কারণ ছাত্রদের পড়ায় অবহেলা, কেউ বা বলেন 'নোট'পড়া ও মুখস্থর ফল, আর কেউ বা বলেন—রাজনৈতিক হৈহুল্লোড়ে বেশী সময় কাটিয়ে ছাত্রেরা অজুহাত দেখায় 'কন্‌ট্রোলের লাইনে দাঁড়িয়ে আর আধপেটা খেয়ে কতই বা পড়া যায়,' কেউ বা বলে 'কলেজে কোর্স ফিনিশ করায় না করব কি,' আবার কারুর মত, 'কোর্সের বাইরে থেকে এলোপাথারি প্রশ্ন করলে পারব কি করে?' প্রত্যেকটি অজুহাতেই কিছু কিছু সত্য আছে, এবার সংক্ষেপে আসল কারণটা আলোচনা করি।

প্রথম কারণ আমার মনে হয় শিক্ষা-পদ্ধতির গলদ, এখনকার ছাত্ররা অনেকটা নির্জীব মেশিনের মতনই, তারা ক্লাসে আসে, বসে—প্রফেসরও আসেন, তাঁর বক্তব্য বলে যান; ছেলেরা বুঝুক আর না বুঝুক, শুনুক আর না'ই শুনুক, অনুগত ছাত্রের দলও বাড়ী গিয়ে Made Easy or Sure Success জাতীয় কিছু মেটে তারই সংক্ষিপ্তসার মানসপটে নিয়ে Sure-success হওয়ার আশা করে, তাদের ধারণা Made Easy গুলোই এক একটা প্রফেসর; কাজেই আসল প্রফেসরকে না শুনলেও চলবে। যাঁরা প্রকৃতই শিক্ষক, তাঁরা আনন্দ পান ছাত্রদের তাঁদের সাধ্যমত

জ্ঞানও শিক্ষা দিয়ে, কিন্তু যখন ছাত্রদের মনও সহযোগিতা পান না তখন নিরাশ হয়ে কলের মত পড়িয়ে যান। অনেকটা দেনা-পাওনা সম্বন্ধ হয়ে ওঠে; ছাত্ররা টাকা দেয় আর শিক্ষকরা টাকা নেন, আর তারই বদলে তাঁরা শিক্ষা দিয়ে যান ওজন মাপা। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ, হৃদয়ের সম্পর্ক যেখানে থাকে না; পারস্পরিক সম্বন্ধ সেখানে শিথিল।

পরীক্ষাকেন্দ্রে অশান্তিজনক ব্যবহার করা ছাত্রদের একটা মোহ হয়ে উঠেছে। অন্যায়কে তারা অন্যায় বলে স্বীকার ত' করেই না—বরং প্রতিবাদ ক'রে প্রমাণ করতে চায় যে এটা অন্যায় নয়, ন্যায়। অনেকে তাদের এই নিন্দনীয় অপরাধের সমর্থন করেন। দুঃখের বিষয় অনেক অভিভাবকও এর উৎসাহদাতা আছেন বলে শোনা যায়।

দু-এক কথায় বলতে গেলে এই বিরাট সমস্যার কারণ হ'ল প্রধানতঃ তিনটি, প্রথমতঃ ছাত্রেরা মাধ্যমিক শিক্ষায়তনগুলিতে নীতিমূলক শাসন ও শিক্ষার অভাব। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের মধ্যে আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণ। তৃতীয়তঃ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়ী মনোভাব। চতুর্থতঃ ঘরে বাহিরে সর্বত্র নৈতিক শিক্ষার অভাব।

ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে। অথচ এখান থেকেই তাদের স্বভাবচরিত্র কলুষিত হয়ে ওঠে। আর এই কুশিক্ষাগ্রস্থ ছাত্ররা কলেজে গিয়ে হাল ছাড়া পেয়ে বীভৎস রূপ ধারণ করে।

সমস্যাকে দেখান হো'ল, এখন চাই এর সমাধান। এই বিরাট সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবর্গ ও ছাত্রসমাজের ওপর আংশিকভাবে ন্যস্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের দিক থেকে আমরা সরাসরি কোনো সাড়াশব্দ পাই না। তাঁরা নিরাশ হয়েই থাকেন, তারপর আসে শিক্ষকদের কথা। তাঁদেরও বিশেষ দোষ দিতে পারি না। সব শিক্ষকই ছাত্রদের উন্নতি কামনা করেন, ছাত্রের কৃতিত্বে তাঁর কৃতিত্ব, ছাত্রের অকৃতকার্যতায় তিনিও আংশিকভাবে দোষী, শিক্ষা দেওয়া তাঁদের পেশা, তাঁদের ধর্ম। কাজেই এই শিক্ষা দান করেই তাঁরা পান আনন্দ। কিন্তু তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা, তাঁদের মূল্যবান উপদেশের অবহেলা যখন ছাত্রেরা করে তখনই তাঁদের মনে আঘাত লাগে, এ'টা খুবই স্বাভাবিক। ছাত্রেরা নিজেদের Prestige রাখতে না জানতে পারে কিন্তু তাঁরা নিজেদের মান ক্ষুণ্ণ করতে পারেন না। ছাত্রদের উচিত শিক্ষককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া, তাঁদের শ্রদ্ধা করা; কিন্তু এই বস্তুটির শতকরা আশিজন ছাত্রের মধ্যে দুর্লভ। এরপর আসে ছাত্রদের কর্তব্য। নিজেদের শোধরানোর ভার নিজেরা নিতে না পারলে কি করে চলে? তাই আজ ছাত্রদের মধ্যে একতার দরকার। ছাত্রদের সঙ্গে অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও সহযোগিতা করতে হ'বে। পারস্পারিক সাহায্যের আদান প্রদানেই এর প্রতীকার করা সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হ'বে শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের জন্য। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হ'বে তাদের ওপর, যাদের দুর্নীতির ফলে ছাত্রসমাজের কলঙ্ক, কুৎসা গ্লানিকররূপ ধারণ ক'রে শিক্ষার মেরুদণ্ডে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করছে। দুর্নীতির বীজ আমূল ধ্বংস করতে হ'বে। তাদের শাসন করবার এবং দমন করবার ভার আমাদের। তাদের আর সমর্থন করলে চলবে না—তাদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে যে সামান্য স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে ছাত্রসমাজের কি বিরাট সর্বনাশ তারা ডেকে আনছে। এখনও প্রচুর সময়—সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এখনও এই কলঙ্ক, কুৎসা দূর করা যায় তবে আমরা আবার আমাদের পূর্ব-গৌরব ফিরে পাব, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের জ্ঞানগরিমা, আমাদের স্বভাব-চরিত্রের আবার পূর্ণবিকাশ হ'বে। ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজের নৈতিক আদর্শের উদাহরণ হতে হবে আমাদের।

দিলীপ চৌধুরী—দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION
1945

On chair (from left) —Amiya Mukherjee (Jt. Games Secretary), Ardhendu Sarkar (Jt. Games Secretary), Prof. Dwijendra Binode Sinha (President), Principal Panchanan Sinha (Chancellor), Ranen Bose (General Secretary), Asim Bhattacharya (Vice-President).

Standing (from left) —Santipada Chatterjee (Common-Room Secretary), Anil Basu (Debating Secretary), Jnanananda Mondal, Samir Dutta (Cultural Secretary), Ranajit Nandy, Umadas Maitra (Poor-Fund Secretary), Jiten Chakrabarty.

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION

General Secretary—RANEN BOSE

When we assumed office, the world was on the verge of political changes. The cloud of war was casting its grim and harrowing shadow over our country. For us, it was in some sense an interregnum of social and political life. In the midst of this chaos, the student community became confused in brain, unsteady in character, disorderly in manners and oscillating in aims and purposes. At this juncture, we naturally thought that it would not be possible on our part to discharge duties to our full satisfaction.

But now I cosider our activities quite satisfactory in the outgoing session. The success owes much to the combined efforts of my colleagues in the office and of the authorities of our college. First of all, mention must be made of Prof. D. B. Sinha, the President of our Students' union, whose untiring co-operation and rational guidance were of much help to us. Our sincerest gratitude to him ! But we must not forget to express our gratefulness to our venerable Principal whose advice was always available in the carrying out of our duties.

Then I should speak of Mr. Asim Bhattacharya, the Vice-President and Mr. Santi Halder, the Assistant Secretary, who helped me in the discharge of my duties. Their worthy services are above thanks. The names of my friends, Messrs. Jyotish Sarkar, Aroon Mitra, Achintya Das Gupta, Govinda Ghosh, Debkumar Chatterjee and Sushil Chatterjee, the Ex-Editor, deserve recording.

Now I want to place before you the factors that prevented us from publishing this issue of our College Magazine earlier. It took us a long time to secure necessary permission from the authorities concerned. Paper was not available in the market. Printing was an affair beset with difficulties. Yet, through the untiring labour of our energetic Editors, the October issue of our College Magazine has at last come to light. Mr. Jibendra Sinha Roy has discharged the editorial duties diligently and efficiently. But it will be unfair on my part if I fail to record the name of Prof. Amiyaratan Mukherjee, the Prof.-in-charge who, with his literary taste and knack, has contributed magnificently to the success of the Magazine. Three cheers for them !

Now, it is my duty to give a short account of the work of the different sections. *The Debating section* was efficiently managed by Mr. Anil Bose, the secretary. He maintained the traditions of his department by organising a number of debates on current affairs, viz, 'Hindu Code Bill is detrimental to the best interests of India', 'Frisco ends in Fiasco' etc. Mr. Santipada Chatterjee, *the Common-room* secretary, left no stone unturned to create an improved atmosphere in the Students' Leisure Hall. He arranged competition in indoor games, and added many new magazines. *The Cultural* secretary,

Mr. Samir Dutta, spared no pains to give an impetus to the cultural life of the students through various activities. Our grand success in *Winter social, Inter-collegiate music* and *recitation competitions* redounts to his credit. But I am sorry to say that Mr. Umadas Maitra could not run the *'Poor-fund'* section efficiently for want of sufficient funds at his disposal. I draw the attention of the authorities particularly to this point. Thus the secretaries of the different sections annexed a number of worthy pages to the history of the 'Students' Union.' I extend my cordial thanks and express my indebtedness to all of them.

Then let me say a few words about our *athletic activities.* Our *Hockey team, Cricket team,* and particularly *Football team* were able to evoke admiration from the game-enthusiasts of Calcutta by giving a grand account of themselves. Two of our Cricket players, Messrs. P. Sen and P. B. Dutta earned *All-India fame* for themselves during the last two years. Several first-division players increased the fame of our Hockey team. But it will not be an exaggeration to state that our football team gave superlative display throughout the season. It had the honour of winning the coveted trophy of Calcutta—*The Hardinge Birthday Challenge Shield.* Hats off to Prof. P. Sen, the Prof.-in-charge of Cricket, Prof. D. B. Sinha, the Prof.-in-charge of football and to Messrs. Ardhendu Sarkar and Amiya Mukherjee, the joint secretaries. Our exit from the Elliot Shield and Ronaldsay shield were nothing but the result of bad luck. The annual football match between the staff and the students was a pleasing thing to witness. In *the inter-class competitions,* the Beharilal Memorial Cup was won by the students of the fourth year Arts Class. Heartfelt congratulations to them.

Now about our *political activities.* Our college has been traditionally in the forefront in all political movements and even to this day does not lag behind. The college in an organised meeting condemned, without reserve, the brutal attack inflicted on the students of Coochbehar by the State Military. It unequivocally and unanimously demanded the release of the I. N. A. men and organised relief fund for them. The naked lathi charge on the students of Lucknow and Lahore caused a great stir amongst the students of our college. The wanton, callous and indiscriminate firing on a students' rally that has recently so deeply excited the city, has taken a toll from our midst. The late **Mr. Animesh Choudhury,** the bravest of the students of Asutosh College, will live for ever in our memory as a worthy martyr for our national freedom. The spirit of Nationalism that we inherited by legacy from our predecessors was thus maintained in good faith and through brave deeds. The students of Asutosh College could not and cannot remain indifferent to the clarion call of the nation.

Our *social activities* do also rightly deserve mention. The Asutosh College Rabindra Memorial Committee, set up by the 'Students' Union', held a magnificent performance in last September at 'Kalika Theatre' to raise funds for the All-India Rabindra Memorial Committee. In that function, Tagore's 'Baikunther Khata' was staged along with a brilliant musical extravaganza. The sale proceeds of the performance enabled the

committee to contribute a sum of Rs 3616 to the Central fund. The elites of the city enjoyed and appreciated the function and applauded the wonderful spirit of the students of Asutosh College. The undying zeal of Prof. D. B. Sinha, Prof. S. K. Chatterjee, Prof. B. Bhattacharjee, Prof. B. Ghosal, Prof. Arundhati Sen and the members of the memorial committee should be taken into account in this connection.

The 29th *Foundation day* of our College was celebrated with due pomp and grandeur. Dr. P. N. Ghose, M.A., Ph.D,Sc.D, F. Ins. P. presided over the function. Prof. D. B. Sinha and Prof. Sambhunath Banerjee delivered lectures dwelling on Asutosh College and its ideals. Then our revered Principal narrated the the history of our College which passed through joys and misfortunes in its life of twenty-nine years. The president gave an elaborate and precise lecture on 'Post-war reconstruction.' He mainly laid stress on the scientific problems of India and their solutions. The staff, students and gentlemen present were entertained with light refreshments at the end of the function.

The students, men and women combinedly, celebrated the *Saraswati Puja* festival in our college. The beautiful decoration of the Goddes, the whole-day programme of music, the sufficient quantity of *Prasad* were the special features of this occasion. The *winter social* of our College also took place at 'Bijoli' in this connection. The physical feats of the champions of Asutosh College Gymnasium amused the spectators. Popular music stars and famous Orchestra party participated in the function. The girl-students should be thanked specially in connection with the Saraswati Puja Celebration.

Last of all, I extend my cordial congratulations to my friends who will succeed me in the office of the 'Students' Union'.

REPORTS OF SEMINARS

English Literary Society :—It is a cultural association, formed with a view to creating interestsin English language and literature among the students of Asutosh College. The society arranged regular debates, discussions, recitations with professors on chair to enlighten us on every subject. The English-Honours students of the fourth year Arts class took special interest in the association. The present board consists of Prof. B. Ghosal, M.A., B.L., as President and Mr. Jibendra Sinha Roy as Vice-President.

Aroon Mitra,
Secretary.

Science Society :—This year, for the first time, the idea of forming an organisation of the science students of Asutosh College struck the 'Students' Union.' Hence this society was set up. But to our greatest misfortune, no encouraging response was received from the authorities. So the activities of the society deserve no mention at all. Inspite of this temporary failure, none, we believe, will deny the fact that the future of this nascent society is fraught with much possibilities.

Ranen Bose,
Secy. Science Society.

Historical Seminar :—The first inaugural meeting of the Historical Seminar was held on the 12th July, 1944, at 3 P.M. with Prof. S. Bhattacharyya on the chair. Boys of the Third year History Honours class including some pass students also joined the meeting. Tarakeswar Bhattacharyya, a student of the fourth year History Honours class read an article on 'The cities and civilisation in Ancient Arab' which was highly appreciated. The other two meetings which was held in succession, took place on the 4th August, 1944 and the 22nd July, 1945 respectively. On the second occasion, the President explained the fundamental object of the Seminar which is as follows :—'The object of the Seminar will be to organise debates, discussions on important topics of History'.

Somnath Banerjee,
Susil Kumar Chatterjee,
Jt. Secretaries.

Economics Seminar :—This year's Economics Seminar has witnessed many a departure from the steps undertaken by our predecessors. It is perhaps the first time that the students of the Economics-Honours class are contributing jointly to renowned economic and political journals. The first meeting opened with the discussion of the 'Bomby Plan' under the presidentship of Prof. S. N. Sen. A short essay was read by Bimalaranjan Chakrabarty. The second meeting recorded the discussion of the 'Gandhian Plan' with Prof. P. Roy on the chair. Debaranjan Chakrabarty read an eassy. Among the other enthusiastic parteipants in these two meetings the names of Ratnajit Ghosh, Asim Bhattacharya, Bhabani Choudhury, Debaprashad Das and Ajoy Ray Choudhury deserve mention.

Asim Bhattacharya
Debaranjan Chakrabarty,
Secretaries, Economics Seminar.

OUR CITY OF CALCUTTA

BY

Prof. Sushil Kumar Chatterjee, M.A.

It was not mere chance nor even the pressure of events which most strongly influenced Job Charnock, the father of modern Calcutta and a favourite servant of the Company, when on the 24th August, 1690, he moored his boats off Sutanati on the east bank of the Hughli. History bears witness that the famous Baithak-Khana tree with its thick foliage and shade captivated the Venerable Charnock, otherwise there was nothing in the malarious swamp to recommend itself to the great founder of the greatest metropolis of the East. In 1633, the English already securely established on the Coromandal Coast, tried to explore the new field which Bengal offered to their trade. Charnock was appointed Agent at the town of Hughli. He was authorised to break with the Moghul and establish himself at all costs with fortifications. On its site he found a cluster of tiny riverside villages Calcutta, Sutanati, Govindpur, Salkhia, Chitpur, and the ancient shrine at Kalighat. Legend has been busy with the origin of those early settlements and literary reference to Calcutta and Kalighat is found as early as 1495 A.D. in a poem written by the Bengali Bipradas. With the advent of the Portuguese at the beginning of the 16th century the light of history falls accross the Hughli. At Betor, by the site of modern Sibpur, the foreigners carried on a brisk trade, while five Bengali families broke new ground on the east bank of the Hughli with the settlement of Govindapur, to the south of the modern Chowringhee. These settlers in the course of time came into contact with English merchants, whose ships found anchorage at Garden Reach; and when Charnock was directed to discover a favourable site for the fortified settlement which at least became essential for Company's trade, his mind turned naturally to Sutanati where Fort William now stands. We find Job Charnock in 1690 issuing a proclamation permitting settlers in Sutanati to erect houses at their pleasure on the waste land belonging to the Company. As time wore on, people from outside Bengal, began to come and settle near about the English settlement and thus a rambling haphazard town began to spring up without any plan or orderly fashion and without any pretension to civic amenities or convenience. When a sufficient number of people had gathered round the settlement, attention was directed to unhealthy surroundings and as early as 1704, the Council ruled that the amounts realised from fines levied upon the black inhabitants for misconduct should be expended in filling up and obliterating the foul pits and ditches that abounded in the settlement.

We find the earlier traces of municipal function in the post of the Zamindar. This Zamindar was primarily the collector of Revenue under the Company but he was charged with the care of public order,

convenience and health, and also empowered to make necessary repairs in roads and drains.

In the proceedings of the Council of the East India Company dated the 31st March, 1706, we find certain estimates of public works submitted by one Mr. Fortnam, Civil Architect.

We further read that in 1753 the Calcutta Council referred to above directed the Zemindar to cut down all the old trees and under-woods in and about the town and further ordered him to survey the drains about the town. A surveyor of roads was for the first time appointed in 1766. "For a period of more than 100 years, however," as Mr. Amal Home, the present Editor of the Calcutta Municipal Gazette points out, "the town of Calcutta continued to grow in an irresponsible fashion" and it was vividly described by the European travellers who visited it in the 18th century. William Mackintosh who published his "Travels in Europe, Asia, and Africa" in 1782 says of Calcutta. "there was not a spot where judgment, taste, decency and convenience are so grossly insulted as in that scattered and confused chaos of houses, huts, sheds, streets, lanes, alleys, windings, gutters, sinks, and tanks, which jumbled into an undistinguishable mass of filth and corruption, equally offensive to human health and sense and which compose the capital of the English Company's Government in India."

Grandpre, who visited Calcutta in 1790 is no less vigorous in his indictment. The roads, he says, were merely made of earth, the drains mere ditches between the houses and the sides of the roads, the receptacle for all manner of abomination, dead bodies flunk into any tank or open space and left to putrefy, the only scavengers being the jackals, vultures and adjutant birds—canals and cesspools reeking with putrefying matter, an insufferable plague of flies—these are some of the horrifying decriptions given by the French Traveller.

The high mortality among the European residents was appalling and according to Hamilton in 1707 there were 1200 Europeans in Calcutta, 460 of whom were dead in the next year. There was a severe epidemic in the settlement in the year 1757 and again in 1762 which, it is stated, was responsible for the death of 50,000 blacks and 800 Europeans. Side by side with this high-way robberies, murder and all kinds of lawlessness raged practically unchecked in those days.

From the earlier history of Calcutta, it is found that the civic and police functions were almost always combined in the same person, the Zemindar in the earliest times, the Justices of the Peace later and afterwards the Chief Magistrate far up to the 19th century.

As early as 1727 in the 13th and last year of the reign of George I, a corporation consisting of a Mayor and 9 Aldermen with a Mayor's Court was constituted in Calcutta under a Royal Charter. Their chief duties were to deal with the more important civil disputes among the English residents of Calcutta. The Court house for the buildings for which a tax was levied upon the inhabitants of Calcutta, was erected in 1729 at the site where St. Andrews Church now stands at the western end of the street which still bears its name

—Old Court House Street. This court practically had no civic duties to perform.

A new Royal Charter granted by George II in 1753 reconstituted the Mayor's Court and an ineffectual attempt was made to organise a municipal fund by the levy of a house tax of two to three lacs of rupees to defray the expenses of cleansing and organising the place internally. This, however, made little improvement in the sanitary conditions of Calcutta which continued to be in charge of the Zemindar or Collector of Calcutta, one of whose duties it was to make the drains sweet and wholesome. The most famous of the Zemindars of Calcutta was John Zephania Holwell who valiantly defended the Calcutta Fort against Siraj-ud-dawlla.

In 1799 steps were taken to effect a notable improvement—the metalling of Circular Road. Considerable attention was paid also to conservancy. Lord Wellesley's famous minute of 1803 drew attention to the problem and the long series of important works which were executed during the next thirty years by his Improvement Committee better known as the Lottery Committee. The work of the Justices however was not superseded, though it was overshadowed by the more imposing and heroic measures of the new Committees. The relations of the Lottery Committee and the Justices were thus somewhat analogous to those of the Improvement Trust and the Corporation of Calcutta in our own day. The Corporate control of the Justices, however, in their own province gradually gave way to the concentration of authority in the Chief Magistrate's hands. The steps by which the executive authority of the Justices in Session was in effect transferred to the Chief Magistrate are not very clear but the impracticability of administering a city through a body which met so seldom was obvious and he must have enjoyed a large measure of discretion from the first. A Government Resolution of 12th October, 1830 provided that the duties of conservancy should continue as before to receive the special attention of the person holding the office of Chief Magistrate, and that he should exercise an active and personal superintendence over the establishment maintained. When the Fever Hospital Committee took evidence in 1837 we find the supreme control of the conservancy, assessment and the police all centred in the person of Mr. D. M'Farlan, the Chief Magistrate. He authorised all expenditures and sanctioned all disbursements in the Assesment, Judicial and Conservancy Department. He had cognisance of all complaints and questions.

Inspite of the great works which the proceeds of the Lotteries had served to finance, Calcutta after forty years of the Justices was still a standing offence against all the canons of municipal science. Local taxation however was still almost an untried principle and the Chief Magistrate who derived his authority from Government and not from the people clearly recognised the danger, although he grasped the need of further taxation unless authorised by the consent of the people or their representatives. It would be a mistake to look on the authorities of this time in the unhygienic and insanitary conditions of the city. Municipal reform

was in the air but the non possumus of finance could only be overcome by calling in the King Stork of taxation.

In this view the drawbacks of the paternal system of municipal government became apparent. The system was destructive of self-reliance on the part of the citizens. Government spent all town or municipal fund and considerably more in maintaining the municipal services and it was inevitable that the people should prefer this system with all its imperfections to one which combined new privileges with additional burdens.

It was M'Farlan himself who in 1833 made the first proposal for an experiment in representative Government. He suggested that the municipal committees should be elected by rate-payers of a certain qualification in each of the four divisions into which the town was then divided. The Committees were to be of an advisory character and may be regarded as an adumbration of the modern District Committees.

(To be continued)

LITTLE

[A. K. R.]

A purple '*Banaful*,' in the grass,
A slanting golden ray,
A cloud that o'er the hills may pass,
A butterfly's light play,

One star within the sunset skies,
One note of music rare,
One irridescent drop that lies
Hid in some blossom fair,—

Can fill some heart with joy ; and not
One beauty small as these
Is by the "Poet-God" forgot,
To soothe, or cheer, or please.

Not mighty deeds alone are good
Not eloquence is dear
Alone ; some hearts who these withstood
Have melted at a tear ;

A mother's love to one out cast,
By soft-eyed Mercy given
Hath brought the wanderer at last
In penitence to Heaven.

And the kind look, the kindly word,
From out the heart's best store,
Do good ; by them some soul is stirred
To hope, unknown before.

Give we of these in every place ?
Let us not niggards be !
"To smile upon thy neighbour's face"
Saith one, "is Charity."

It is by little things we live
By little things are blest ;
So let us strive each hour to give
Our simplest, as our best,

To gladden dreary days below
With ministries of Love—
Sunbeams on stony paths to sow,
To Light the way, above !!

AN IMAGINARY CONVERSATON*

Sushil Kumar Banerjee (Ex-student)

(Aldous Huxley's Library. Huxley is sitting on a couch with the manuscript of "Wordsworth in the Tropics" beside him. A minute before he was turning the pages of the old manuscript, being too tired to write anything. But he felt strain in the eyes and left the manuscript. He takes one of his eye-exercises and feels a little better. He then takes a cigarette out of his cigarette-case and after a few leisurely puffs, falls dozing. The weather is very foul. The sky is overcast with clouds and it has been raining all day long. A sound of violent thunderburst outside. Huxley starts up and rubs his eyes. Suddenly a figure makes its appearance in the room and slowly approaches Huxley who is, for an instant, seized with awe and nervousness. The next moment Huxley recognises even in the dim light of the room the well-known figure of Wordsworth with white locks hanging down and he straightens up. A conversation follows.)

W—Pax vobiscum.

H— How dare you, you devil—

W—Stop! Stop! I now belong to the hierarchy of holy angels. Don't you notice my wings and the halo around me? Oh! I see. I forget that you are a mortal.

H— Well, my precious angel! What can I do for you? Have a cigarette.

(Produces his cigarette-case)

W—Thanks, no. I ceased to be your friend since you calumniated me in the vicious article lying by your side. I have come all the way from merry Elysium down to this filthy earth to refute the nefarious charges you have brought against me. I shall get no peace until I can honourably acquit myself. I wonder what made you an iconoclast.

H— But the charges are true.

W—True indeed! You have condemned my philosophy. I was a poet first and philosopher next. People never go to a poet for philosophy alone. If my philosophy was unsound or even wrong (which it never is in my opinion) let me alone. If you find fault with my poetry, call me what you like. Shelley was an atheist out and out, but no reviewer of his poetry has ever found fault with his philosophy.

H— A poet must see Nature from all points of view. You ignored the sinister and the more important aspect altogether and put all the emphasis on the tender aspect. Was not that a defect?

W—Did I really? Two of the extracts from my poems that you have chosen for your article give the lie to your own statement. Did I not commend in *Peele Castle* the picture of "this sea in anger and that dismal shore"? In *Ruth*, did I not speak of "the wind, the tempest roaring high, the tumult of a tropic sky?" *(Takes a folded paper out of his pocket and finds out the underlined portion)* Listen to what Lamborn

*.....With apologies to Landorians.

remarks, "the most important lines in these otherwise uninspired verses are those which prove beyond all doubt that Wordsworth's theory of an indwelling spirit in Nature was not pantheism ; it might inspire evil as well as good."

H— Lamborn is a dilettante ; I can very well spare him. Were you not inconstant when you turned an Anglican Tory ?

W—I admit I was inconsistent and you confuse that with inconstancy. You yourself have inveighed against all sorts of consistency in your article. My inconsistency merely shows that I was courageous enough to cling to the faith that I believed true then. What does it matter if a man changes the faith of his early youth when he finds that his soul responds to the new faith ? You have rashly gone to the length of pitying me for not travelling beyond the boundaries of Europe, but that is as ridiculous as pitying you for not being a poet-laureate. I can travel now as extensively as I like, but still I have not changed my ideas which found expression in my poetry. I sought peace and comfort from Nature and she gave me both. Could any amount of travelling shake me by an inch from the faith that I felt to be true with all my being ?

H— Your talkativeness bores me *(a little irritated)*. What do you say in defence of your having an illegitimate child in France ?

W—*(A little shocked)* Come now ! Don't you feel a scruple to allude to my personal character when criticising my works and ideas in general ? I apprehended a moment ago that you would not spare anything to let me down in public. Anyway I must give an answer. Do you recollect how many mistresses Byron and Shelley had ? How many illegitimate children ? Were they ashamed for that ? What if I say that I loved the French girl and would have legally married her if your foolish laws had permitted me ? I did not disclose the fact in my lifetime because I cared much for domestic happiness. I sent her money regularly and held myself guilty ever since. If the laws had permitted bigamy, and if I had married the girl and left her in France, I would have then been applauded instead of being condemned. Thus you follow the law by word. I am sorry and have atoned my rashness all my life through. But is it laudable to slander a poet when you find no other means to defame him ?

H— Murder will out. The fact came to light before and I made use of it to make my criticism more poignant. You incited the French Revolutionists ; that was also an act of rashness, I suppose.

W—Call you it an act of rashness ? Do you forget my line "What man has made of man" ? My heart ached for the suffering humanity. I felt for the French drudge and regardless of consequences I merely pointed out their right, who, in their turn, found means to establish it. What a nice question for a thoroughbred modernist and liberal like you to ask !

H— Well, I must take time to think over your arguments. I am awfully tired

now. In fact, I was not prepared for your arrival. If you can come another time—

W—*(Inturrupting)* Oh! no. I can't. *(Looking at his watch)* Oh! it is tea-time. I can't wait. They will be waiting for me in the Garden of Eden. By the way, I promised my friend Pascal when I came here that I would speak a word or two for him but—it is getting late—*au-revoir.*

(Huxley's favourite Puss mews. He looks round and the next moment he finds that the apparition has vanished. A little confused, he sits comfortably and presses the bell for tea.)

SONGS OF YOUTH

Amiyaratan Mukherjee

I

Who but I, the Poet, *will get the scent of the Bud ?*
Who but I that get the scent of the Bud
will tell much clearly of the Bud ?
Who but I will divulge the secret,
that a bud there is,
peeping and keeping aloof,
braving, and craving to burst into maddening smell
in the hidden bush of your blinking heart ?

A Poet of the Bud am I,
And who but I will catch the sigh of the Bud ?
Who but I that croon the sigh
will ne'er be shy of the truth
that if I, in glee, an amorous bee, shall touch the bud
and gripe the bud
and suck the bud
the Bud isn't conquered, *but you,*
yourself also.

II

Why does *love* wake up today in the tears
of mine eyes—
The love I met once and left aside
in the whim of meaningless songs ?

Why does *song* pain m e tonight in the tune
of dolorous dream,
The song I sang once and forgot in vain
in the whim of ascetic calm ?
Why does *the flower* focus the flame of a music pain
amid the calm of rosy sleep—
The flower that bloomed in hope for me
and faded under the Sun of slight ?

III

In vain, am I vocal, O Heart, my Heart,
In vain alas, I fret,
I foam,
I sing.

Alas, my God, he sleeps o'er my wail
and cares ne'er for my mystic croon,
He, ah he, whom I make my garland for,
He, ah he, whom I fondle in dream :
a beam of dimming hope.

IV

Love peeps through hope against hope,
Yet my Love does not deign to come.
Ah, the autumnal night has set in
as a rogue,
and the moon smiles in the distant sky
as a cruel neighbour
at my distress and pain !

V

Be consoled, my darling,
You will find her surely, surely this night.
This night must she come to you,
She must,
She must come in the dance of your
poetic dream,
She must.

How can she keep you off, my darling ?
When *Falgun* sighs in the Southern breeze,
And *rapture* rages in the moon ?

ASUTOSH COLLEGE FOOT-BALL TEAM

WINNERS—HARDINGE BIRTHDAY CHALLENGE SHIELD

1945

On Ground (left to right)—Biren Chakravarty, Rabin Banerjee.

On Chairs (left to right)—Sukhendu Banerjee, Amiya Mookerjee (Captain), Prof. Dwijendra Binode Sinha (Prof-in-charge), Ardhendu Sarkar (Games' Secy.) Arun Sinha, Manik Mitter.

Sitting (left to right)—Sasanka Goswami, Haren Ghosh, Sailen Banerjee, Indrajit Roy Chowdhury, Subhas Dass, Debu Bhattacharya, Bibhu Samajpati, Arun Bose, Manindra (Bearer).

ASUTOSH COLLEGE GYMNASIUM

ASIATIC, INDO-CYLON, ALL-INDIA, ALL-BENGAL, INTER-COLLEGEGIATE

CHAMPIONS

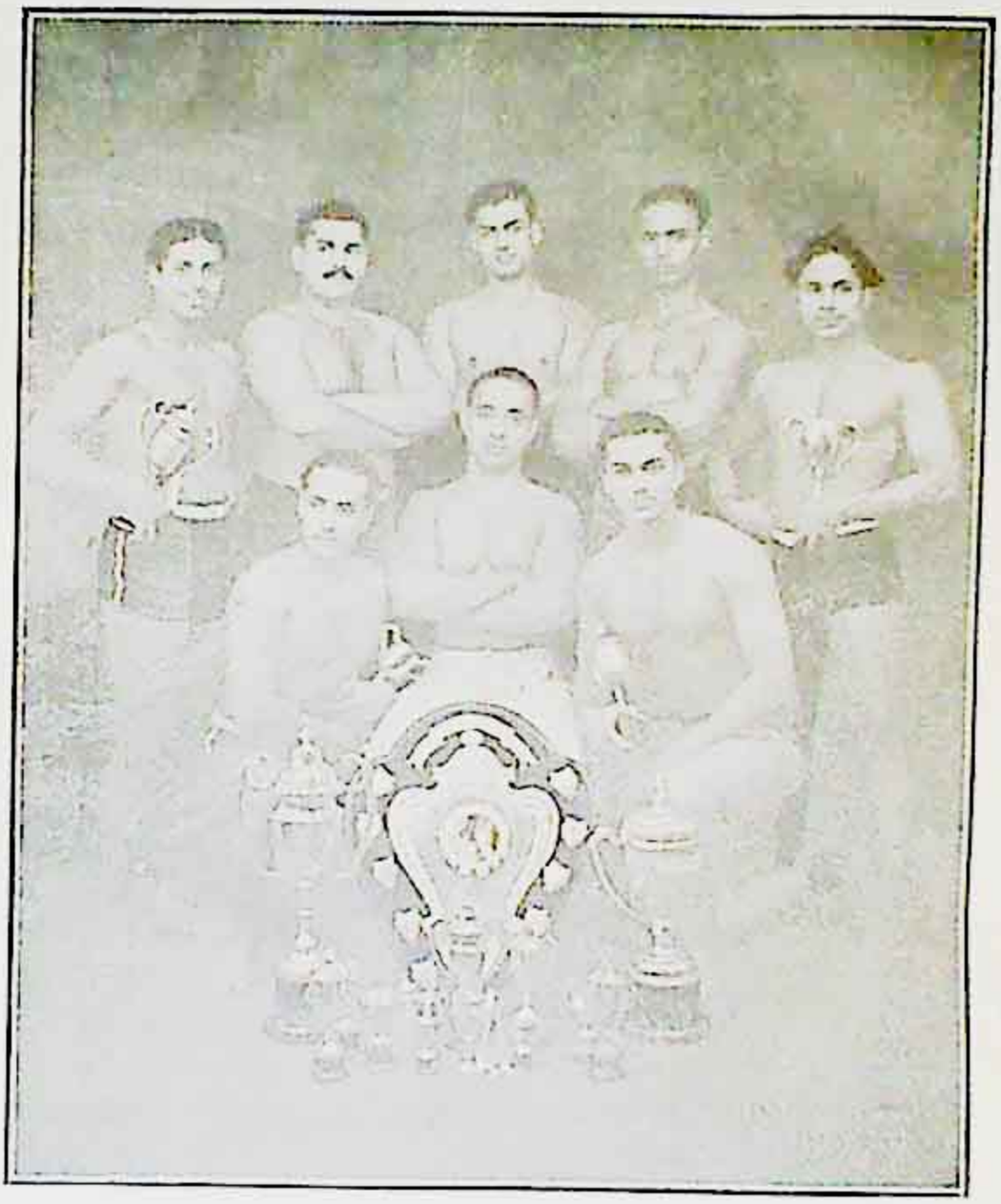

Standing (from left)—Sanat Biswas, Hem Mukherjee, Brojo Banerjee, Sisir Chatterjee, Sankar Khan

Sitting (from left)—Sarada Chakravarti, S. Ganguli (Instructor), Pranab Banerjee.

EXPERIENCE

Arun Kumar Dutta Gupta—Third Year Arts

He was my brother, my own brother; but he was a ghost, practically speaking, for rotten thoughts had long made an end of the man in him. And one day he came to me and declared :

'I love mother as profoundly as you do, and therefore I want to divide her between you and me, and go away with my share.'

I said, 'If you love her as much as I do, you may have entire possession of her; I shall not murmur. But I don't like to divide a human body as a butcher'.

'But I like', growled he, 'I'll not take all, for I am not so greedy. I'll take only a part—the head, I mean, and I don't care whether you like my idea or not. I will sever my mother's body, and depart with the head, for I won't live with you. A brother is the worst neighbour in the world, inspite of all that others may say. I'll take the head, I tell you. I'll not listen to anything you may have to say. The body will be left for you, and you may take it up or allow it to be lost'.

'But why are you so afraid of living together ? you will not be able to enjoy a dead head, and also union is strength, you know. The mother will die, moreover !'

'Hang your union ! I shall see if the dead head speaks to me'. A few minutes later he bade me farewell—my mother's blood-stained head in his bloody hand—and went away, leaving me in tears.

That night I could not sleep at all; but during the small hours of the morning I slept a little.

The next morning that unlucky fellow returned.

'Hallo, do you hear me ? I tell you mother does not speak at all. So we are missing each other's love—both of us'.

'How can a dead head speak, you fool ?' I said.

'Does any body die if the head is taken off ?'

'You learn it for the first time, isn't it ? You must know that love grows in union, not in separation'.

'Then mother is dead ? O, what a loss !' and he gave out a pathetic cry. But I told him not to lament, but to go out to 'Pakisthanists' and tell them the tale of this sad experience.

THE SOUL

Susanta Kumar Das—Second Year Arts

The Soul which comes and goes
With a painted picture, shows
The world is nothing but a Stage ;
Men do not understand, but gaze
With eyes worthless, naked and blind
To grope in dark and nothing to find.

AN INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY

Gour Mohan Basu—Fourth Year Arts

Men of the present times are unfortunate because they are ignorant of many an adventure, many a romance, and many a noble deed of their remote ancestors. But man's interest in man is ever increasing. His insatiable quest is urging him to open the store-house of the glories of the past ; and with the help of archaeology he attempts to do so. The aim of the study of archaeology is to reconstitute the complete history of a particular period or subject of inquiry with the help of scientific methods.

The first scientific archaeologist was Thucydides, the great Athenian historian, inasmuch as he added, in the simplest style a preliminary chapter on Archaeology to his great History. But after Thucydides, a handful of men only came out to attempt to follow in the footsteps of the great master and man's interest in antiquity began to decay. Moreover, after the fall of the Roman Empire different streams of barbarian hordes poured all over Europe and submerged European culture under a stupor for centuries.

Salvation of degraded Europe came much later. In 1453 occurred that remarkable phenomenon, the fall of Constantinople, which shook the civilised world and caused Europe to enter into a new age of activity, the age of Renaissance. The remains of ancient Greece which were exhibited in Europe by the Byzantine fugitives aroused deep interest in the minds of some scholastic travellers to study the remnants of antiquity and urged them to go to Constantinople. Pierre Gyless, a French man was one of them who can claim, without dispute, to have been the first competent student of the archaeology of Constantinople ; his compilation, 'De Topographia Constantinopoleos', is a valuable book on Constantinople.

Since Gyless archaeology was making steady progress. With the appearance of Heirich Schliemann in the latter half of the nineteenth century the modern history of archaeology began. Inspired with Homeric poems he proceeded to elucidate the history of ancient Troy and made startling discoveries of the Mycenaean civilization

In connection with the development of archaeology, the name of Napoleon must be mentioned because he was probably the greatest individual patron of the subject. During his long stay in Egypt he employed archaeologists to discover the old splendour of the Memphian Pharaohs. The Egyptian antiquity, imprisoned in the dark cell of oblivion and obscurity, made its silent appeal, through the sky-kissing mute pyramids, to the son of liberty to unfetter the chain of its bondage and recognise them in a new light. Its appeal

was granted and therefrom devolved the Egyptian archaeology known distinctly as Egyptology. Very soon was discovered the old Egyptian civilisation which boasts of priority to several prehistoric cultures. Indeed, 'forty centuries' were 'looking down on' Napoleon !

Archaeology has rendered immense help to history by filling up the lacunae. The Romano-British period of English history, for example, was much corrected and studied anew in the light of archaeology. Again, in other spheres whole chapters have been added to history. The cases of the Mayanculture of central America and Aztec culture of Mexico may be referred to in this connection.

In extent, the scope of Archaeology in the study of the prehistoric periods is prodigious. What Schliemann had begun was continued by Sir Arthur Evans, whose researches at Cnossos elucidated the Cretan civilisation, the greatest prehistoric culture in the Aegean, and threw light on the Mycenaean world, the sequel of the Aegean culture on the mainland. Within a few years archaeology made another long jump by removing the veil off the long-hidden civilisation of immense importance in the hinterland of Asia Minor—the Hittite. Then came the exploration of Sumerian sites in Mesopotemia which added a farther stage to the inquiry and it became clear, as Casson says, that both the Hittite and the Cretan cultures owed something to the Sumerian. Mention should also be made of the epochmaking discoveries of Sir Leonard Woolley of the Biblical Ur, the land of Abraham.

In eastern Asia the excavations of a Swede, Dr. J. G. Anderson revealed a prehistoric, possibly Neolithic, culture of ancient China. In the south, the recent excavations at Mohenjodaro and Harappa in north-west India by late Mr. Rakhaldas Banerjee have revealed a culture that belonged to the fourth and third millenia B. C. In the Far East fine work has also been done by a French school of antiquities on the early history of the Khemr civilisation in Cambodia.

The research work on archaeology has been classified into several groups of which Numismatics, the study of sculpture and arts, study of architecture and the study of old inscriptions are the most important.

Numismatics or the study of coinage has filled up many a blank chapter in the histories of the different countries of the world. Since the important discovery, in 1824, by Colonel Tod, that Greek coins had once been struck in India, the names of Greek, Saka, Pahlava princes ruling territories round the Indian frontier, have gradually been recovered from coin legends. 'Thus coins alone have been responsible for the recovery of a whole period of Indian history,' says Brown.

The study of sculpture and fine arts has illumined several dark parts of history. In India, for example, the study of the Gandhara art has elaborately marked the earliest intermingling of Eastern and Western cultures.

Epigraphy or the study of inscriptions has revealed various hidden mysteries of the past. Who could have surmised before Princep's deciphering Asokan rock-edicts and inscriptions that in the Great Maurya there appeared the greatest and

the best monarch 'that ever lived in tide of times'? To this particular department of archaeological study the greatest service has been rendered by Thomas Young and Jean Champollion.

To-day archaeology has won its legitimate place in the scientific study of history. The efforts of archeologists are often subsidized by Government or other corporate bodies. The research laboratories of archaeological scientists viz, the museums are being enlarged and properly managed by the state. Field work in the shape of excavation is carried on with much enthusiasm by the societies under the control of Government.

The amazing discovery of the Old Indian civilisation has opened the eyes of cultured India to the fact that under the Indian soil there exist several treasure-houses of antiquity. It is the duty of the Indian people and the Government, to unearth the old splendour of Hindusthan to illumine the dark and hazy past, and rewrite the history of our country in the light of the latest researches.

COME, THOU !

Jibendra Sinha Roy—Fourth Year Arts

When the stream of life dries up,
Come, *Thou*, in a shower of pity ;
When all the charm fades away—
Come, *Lord*, in a rapture of song.

* * * * * *

When the dusts of desire rage up
Filling the mind with illusion,
Thou Sublime and Omnipresent,
Come with *Thy* radiant Light.*

*From Rabindranath

'Meet the slum men and know their needs and feel their pinch. Lift them up from their wretched untouchableness that drags the entire nation down inch by inch and every minute. Tell the toilers of the soil that they too have a share in the profit from the raw materials that enrich the foreigners who are ruling our country. Take the hands of the coolies and endeavour to gain their confidence.'

—Dr. Syamaprasad Mookerjee

ORIGIN OF LIFE

Prof. Dinendra Kumar Mitter, M. Sc.

What is life? Is it some inscrutable process, governed by a 'vital principle' beyond the scope of physics and chemistry? Or, is it merely a somewhat peculiar expression of the same 'mechanical' forces which govern the world of inorganics? We simply fail to answer. Men of science and philosophers, begining from Aristotle who lived in the fourth century B. C., have attempted to define life but it was found to be practically impossible. The only way we can identify life is by its manifestations not known in the inorganic world. Phenomenon of life is regarded as involving some constantly occuring changes, and those changes are nearly always spontaneous, active and internal, and not like the change of an iron bar under the smith's hammer.

How this mysterious, inexplicable 'life' originated in this earth, which has not yet been traced in any other planets or stars? The highest expression of life is reached in human lives, endowed with a mind and will-power. To search for the beginning of things is one of the pleasant tasks of human thought. Primitive philosophy invested the 'riddle of life' with many fancies, strange and curious. Empedocles, the Greek naturalist, who lived in the 5th century B. C., 'fancied living creatures as arising from the four elements—earth, air, fire and water, under the action of the forces of love and hate. The animals first formed, appeared, not as complete individuals, but as parts of individuals—heads without necks, arms without shoulders, eyes without sockets. As a result of the triumph of love over hate, these parts began to seek each other and unite.' The old-fashioned teleologists say, 'it is the creation and wisdom of God.' To-day, we shake our heads learnedly and call these as 'crude ideas.'

The earth, our pleasant homeland with the murmuring of its rivers, with the green shade of its fields and meadows, with an endless chain of living creatures, was nothing like it is to-day at the time of its birth. It was born as a mass of gaseous body—extremely hot,—being torn out of the body of the sun, some millions of years ago, when a bigger star was passing speedily in space and came in the jurisdiction of the gravitational attractions of each other. In the vast space, that torn-out piece of hot gases, began to rotate round the parent sun, and lose heat by continuous radiation, cooled and a hot liquid mass was obtained, which on further cooling formed the hard crust of the earth, with its mountains and valleys, ditches and caves. The vapours condensed, came down as torrents of violent showers,—flowed the rivers, formed the oceans. These changes took place in remote geological ages, and are estimated to be somewhat between 2,000 and 3,000 millions years old. This conjecture was made on the

basis of radio-active elements, Uranium, Thorium etc. By observing the disintegration of Uranium and its conversion into Lead, the age of the earth, since it solidified, is calculated not exceeding 3,400 millions years. On the other hand the oldest rocks, so far discovered, reveals this age as not below 1,400 million years.

There was no life upon the earth, in early geological periods, and there is every reason to believe it. It became possible some 500 to 1,000 million years back when the earth had sufficiently cooled and stabilised. But in what form did life originate? Surely, not in the form of a human being or an animal, or a plant that we see to-day. It was totally different. Several theories of its origin have been put forward. Men of science, however, now-a-days believe that life—the living matter—was synthesised in nature in a mysterious manner out of non-living materials, inorganic elements. This probably took place in water and possibly in the sea. Again, the query arises—in what form? Probably in the form of a simple gelatinous mass, more or less colourless, transparent. The scientists had termed it protoplasm (Protos means first, plasma means anything formed, or in other words, the first formed *life* on Earth).

Protoplasm is a very complicated mixture of many chemical substances, crystalloids and colloids, the greater bulk of which is composed of water, being about 80% or more. Next to water come proteins, then carbohydrate, fats, inorganic mineral salts. Carbohydrates, as for example, sugars, have been synthesised in the chemical laboratory from simple inorganic matters, so also amino-acids which are very closeyl related to proteins. Therefore, it is not very difficult to conceive of the possibility of such a synthesis taking place in nature particularly in water where all the raw materials were present.

An analysis of living protoplasm is exceedingly difficult. During analysis it is killed and as soon as it is killed, it loses its real character, i e, its livingness. When we analyse a dead mass of protoplasm, we do not analyse the protoplasm in its real form,—i.e. in its living form. It is, however, ascertained by chemical analysis that protoplasm contains Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Sulphur, Potassium, Magnesium, Phosphorus, Iron, etc., the same elements of which inorganic matter is composed. Thus, it still remains a mystery, how simple inorganic elements unite together and change into a 'marvellously complex whole'—the animate protoplasm. What is that magic-wand which kindled the 'flame of life' in the inorganic world?

The body of all living beings—plants and animals—beginning from the lowest to the highest, including man, is built up of minute chambers, called cells, resembling very closely the bee-hive chambers. These cells which may measure $\frac{1}{1000}$th of an inch or even smaller, are filled with protoplasm. Characteristics of livingness are usually assigned to metabolism, growth, respiration, reproduction etc. Experiments have evidently proved that these are performed by the protoplasm contained within the cells. No 'life-process' is possible without protoplasm functioning. It is constantly busy doing so, quite hidden

from our eyes. A microscope only tells us the story, and that also in fragments.

There are many things to know. It is not known as yet, how the simple inanimate matters changed into complex animate protoplasm, and how the elaboration and organisation of protoplasm took place in carving the plants and animals and the human figure, the highest type of the living form, from a most simple and insignificant beginning ?

Through accumulated knowledge, it is however, established beyond doubt that protoplasm forms the fundamental basis of life. If we could get to the bottom of the origin of this substance, then we would have found out the origin of life, which in all probability has originated on this earth alone, and no where else in the universe. Is it an accident, or an amazing transformation of inorganic matters or a curious expression of thermodynamics in space and time ?

We look to the physicist, the chemist, the biologist, the philosopher for the answer, which so far they have not been able to produce.

A PLEA FOR 'COLLABORATION'

Mani Chatterjee—First Year Science

So long we Indians had no opportunity to make ourselves familiar with the American way. But this devastating and otherwise hateful war has now made it possible ; the swaggering Yank is a common sight and no longer the object of curiosity. Indians and Americans are rubbing shoulders with each other as they have never done before. To know the repercussions of these young Americans, who have come out to India, leaving far, far behind their homeland, is in itself quite interesting. And there are such vast differences in customs, dress and manner of life in India from what they have been used to at home that these reactions are apt to err on the side of prejudice. That is why I suggest the more we mix with each other, the better for both.

I know a lot of them, of different types and ranks ; poet and politician, philosopher and church-man. The general opinion of the Calcutta people is that the American soldiers are rather bad types, blustering and aggressive, and are doing our country harm. This opinion is generally based on stray experiences and sometimes mere rumour.

Facts are however otherwise. They are really a friendly sort. Let us take an example. At the time of last 'Rathajatra' they looked on with wonder at the vast procession, the chariot drawn by hundreds of people and in fact couldn't guess anything what it was all about. So long they were both puzzled and amused. But when I started explaining to them the meaning of it, they really got interested and became serious listeners to my inapt explanation. And then a lot of urchins joined the show. They fished out a hand-cart and made some

ether Yanks ride on it and began to push and pull the same. It was a great 'tamasha'. And these Yanks too got into spirit of the fun ! Another evening, on boarding a tram, I found a smallish fellow in an officer's uniform trying to figure out something. He asked me if I spoke English and then asked my help in reading an advertisement in the tram, written in Bengali ! I dropped into conversation with him who later turned out to be a student of Harvard and Columbia University and an ex-teacher. He is now learning Bengali.

True American Christians are a really saintly people. They have trained themselves up to live in the most frugal manner. And they do live such a simple life that on several occasions I had to blush at my luxirious habits. Often they used to discuss Hinduism with me. It was a pity I was not well up in Hindu religious lore ; but that did not stop them from taking me seriously. They always tried to impress upon me the greatness of their own religion, but at the same time always gave me a patient and courteous hearing. On the points they disagreed with me, they were quite frank and each of us left the other feeling intellectually refreshed. I accompanied them to many of their religious gatherings. In the meetings they do three things,—first of all they sing the hymns in choruses ; secondly, they preach the Gospel, according to Saint Matthew, and after that they all pray to Jesus Christ, the Lord and Saviour of mankind. I quote a song here :—

'What a fellowship, what a joy divine ;
Leaning on the everlasting arms.....'

This song really charmed me.

One thing I have marked in them all ; whenever they say anything concerning the U.S.A. they do that with an air of gravity ; always they refer to the U.S.A. as their 'Great country'. Such intensity of feeling can never be worked up artificially. It develops of its own accord. What indeed must be the state of the country whose sons and daughters feel such emotions even at the mention of her name ? Lincoln's words are in their blood : 'Every man is born free,—every man is born equal.' It is remarkable, but none the less very true, that very few Americans suffer from inferiority-complex. They bear themselves proudly, realising that equality of status is the birth right of each of them. They are at liberty to do anything they like, so long they keep the discipline ; and this idea of discipline has been developed in them voluntarily, without being forced.

America, like India, is a vast place with distinctive variations in local people. But wherever they may come from and whatever their religion or their racial background or their education, there is a certain quality that at once marks them out as Americans. Americans may look different ; they may talk and act differently or may hold many opposing opinions ; yet there is a common attitude and point of view which speak of unity and national consciousness among them. Perhaps this is the core of this nation's strength.

THE MISSING LINK

(A MORAL PLAY)

Baldyanath Chakravorty—First Year Science.

(M. enters dressed in black trousers and a white shirt with 'M' written in block letter on his breast.

M—Now gentlemen—You see my name is Mr. 'M'. I am the thirteenth letter of the English Alphabet. And lo! behold! —my bosom friend Mr. 'N' is coming.

('N' enters dressed in black trousers and white shirt with 'N' written in block letter on his breast).

N—*(Shaking hand with 'M')* Good morning Mr. M, How do you do?

M—Good morning! Good morning! O.K. I think it's all right with you, eh? Now, you see, I am in a nice fix. All these gentlemen have given the palm of superiority. They say, I am superior to you inasmuch as you are my follower, being the fourteenth letter of the English alphabet. Don't you agree to this that I am superior to you?

N—*(With an expression of hatred)* Fie upon your superiority! You seem to make a parade of your name. But as it is my nature to keep silent always, these gentlemen probably do not know the real significance of my name. You will be astonished to mark the total reversal of your crazy idea, that is, how superior I am and how inferior you are, if I go on rehearsing my reputation. I am *noble, new* and *necessary*. I am the power of *nutrition* and *nourishment* but for which men cannot survive. But what are you? you are *mad*, a *minute molecule*, a *mule* standing for no humanitarian purpose on earth.

M—But, I say, be careful. Our friendship may end in hostility. Don't you see that I am the *master* of everything, *motto* of everybody and a *messaiah*. I have got *much more material* than you. I am the *mathematics* of the *matriculation* examination. I am the *maker* of *mercury* and *manganeese* and I am the *monarch* of all I survey. But you are *no-body, none, nowhere, nasty, naked*, and *notorious*.

N—As you say, I may be noboby, but remember it or not I am the the *Nizam* of Hyderabad, the richest person in India; *Newton*, one of the greatest intellects of the World and the *Nile*, the life of Egypt. But you are only *monotonous mutinous, meaningless*, a *mongrel*.

M—*(Quite angrily)* Shut up! I am the *Missouri*, the boardest river in the world; *Mahatmaji*, the greatest politician in India; *Martin Luther*, the preacher of Protestantism and *Macaulay*, the champian of the western education in India. I am a piece of *magnet* attracting everything. Do you know that I am a *member* of the parliament and a *military* police and can *molest* you with *martial* laws.

N—*(With his right hand placed on the back of 'M')* Have patience, my friend! I

cannot find you more than a *mosquito* and *mouse*, *massacring masses of mankind*. You are a *mean*, *mysterious* and *malicious* person always *misbehaving* and *meditating* upon *malpractices*. But you see, I am *nature*, full of beauties; *Noorjehan*, the light of the world; a *nymph*, the adorer of heaven. I am *neutral negotiating* friendship between two factious parties and I am purely *national*. I am *nitrate*, fartiliser and the whole world accepts me as *nice*, *non-aggressive*, a *noted* person to reckon with.

M—Well, my friend! I find you a very cunning opportunist. You advise me to be patient but you are going on with no end of self-aggrandizement. But a little examination will show that I can make a mess of all by my *magnificent manoeuvre*. I am *money* sweeter than honey—I am *mercy* nobler than courtesy I am *morning* famous for its *marvellous* and *misty* hue and I am *music*, which untwists the chain of harmony. But for you, my dear friend if I have ought to say, I can tell without the least shadow of doubt, that you are a *negligible nomad* indulging in *narcotic*.

N—*(With great agitation)*—But I still say that I am *Nesfield*, the Grammarian; *Nestle's Chocolate*, the favourite food of Children—*nightingale*, the melodious bird of *nature* and *non-violence*, the ideal motto of Gandhiji. But you are a tailless *monkey*—inferior to a donkey.

M—*(Angrily)*—My patience is lost! No more in words—I shall now prove my superiority physically—*(When 'M' is ready to lodge a blow at 'N', Mr. 'A' dressed in blach trousers and a white shirt appears; with 'A' written in block letter on his brest.*

A—*(Impatiently)*—What's the the matter, friends? why is there so much row?

M—*(Heavily panting)*—See, this gentleman is insulting me in the most filthy language. You be the Daniel deciding who is superior—he or I?

A—*(Standing between 'M' and 'N')* Dear friends! Don't you see that M—A—N make up the word *man*. It is the greatest creation of God. So gentlemen neither you nor He nor I, am great on this earth. But it is *man* who is superior to all others under the sun. Come then and miss me not.

'It seems to me quite clear that India is on the verge of constitutional changes that will be an increasing responsibility on young men.

'If you realise this and accept a high degree of personal responsibility for type of public affairs that the future hold, then I would have no great anxiety for the future of this great heritage of yours.'

Mr. R. G. Casey

COMMUNAL PROBLEM OF INDIA

Krishna Lal Chakravarty—Fourth Year Arts

Almost all the problems admit of some solution but India at present faces a problem which, despite strenuous efforts of renowned personalities, remains unsolved. This problem is that notorious communal problem of India which like an ominous patch of cloud has darkened the political horizon of India. The seed of communalism sown by Ramsay Macdonald, formerly the Premier of England and the pioneer of labour movements there, and watered by the political opportunists has grown into such a big tree that it has now completely blocked the way to the National Independence of India. Communalism may, however, be allowed to exist in religious matters as we find it prevailing even in England in different forms of Catholicism, Protestantism and Presbyterianism, but it did not appear in the domain of politics until the recent political reforms of India in 1919, an ominous year in the history of India. Communalism, I have pointed out, may be, tolerable to some extent in religious circles and in this sphere it exists in England even. But if it threatens to dominate the people in political life it is undoubtedly dangerous; for, there it leads to far-reaching consequences suicidal to the interests of the parties concerned. This is why religion should no longer play any part on the political stage in any country and in the history of England it was first abandoned by the rulers after the tyrannical sovereignty of Henry VIII in the mediaeval age. The leaders of our country, too, have rightly condemned it as an expression of the mediaeval spirit which was no place in modern politics. Russia and almost all other progressive Nations of the world have denied the claim of religion to interfere in political sphere.

We ought to learn all these and try to banish religious fanaticism from the domain of politics. We ought to bear this in mind that the people of India would never be in a position to avail themselves of the happy opportunity of winning the much coveted freedom, if they do not succeed in composing the communal differences which spring mainly from religions orthodoxy. The communal award is nothing but the sugar-coating of a bitter pill the taste of which has embittered us to the utmost. This spirit of communalism has left millions of our country-men to die of starvation. The policy of the Britishers is to perpetuate their rule in India by adopting the policy of 'divide and rule'; and the communal award is the concrete expression of that policy. It is to make their rule permanent that the British Masters have everywhere pursued the same policy. The conflict between the Hindus and the Muslims in India is the out-come of this policy; and the same sort of conflict had been wilfully created in every place the Britishers have gone to. The conflict between the Jews and the Muslims in

Palestine is a consequence of the same policy. The internal strife between Northern and Southern Ireland is another example of it.

The issue of Pakisthan springs from the policy of communalism. It is devised by the supporters of British rule. These supporters, alas, do not know that the sun of freedom shall not rise in the East so long as the Indian political sky will remain darkened with the black cloud of communalism.

Let us say, freedom first, freedom second, freedom last, forgetting all about our differences. When India will be free, all differences of viewpoint shall merge into one aim : viz. that of national unity, but for which no nation can thrive in peace, plenty and prosperity.

'TO BROOK-LETS'

Baidya Nath Kundu—First Year Arts

Flow ! brook-lets, flow
Beneath the eye of day ;
Roll on in a singing show
Till the buds decay.

Dash onword your tide—
Madly in joyful sports ;
Push forward in pride—
Clashing th' fishing boats.

Let the rays all turn
Red and glittering gold ;
Let the evening earn
Odour and charm untold.

Hark ! in rural glades
How the cuckoos sing !
Lo, the grossy blades
How with winds do ring !

Flow on, faster faster—
To-wards the watery grave ;
The *sea* that loves disaster
Beckons the dauntless Brave.

ASUTOSH COLLEGE ESTD. 1916 LIBRARY

NOTICE

Students, both men and women, and members of the staff of Asutosh College are hereby invited to contribute to the College Patrika. *Short and precise articles, stories, poems etc. written with a fair spirit of originality on subjects of general interest will be welcomed.* Ex-students are also eligible for contribution to our College Patrika. Sketches portraits, cartoons etc. must be drawn in China ink.

All writings for publication must be written, if possible type-written, on one side of fool-scap size paper and should be accompanied by the full name and address of the writer, *not necessarily for publication but as a guarantee of good faith.* Rejected writings cannot be returned.

Contributions should be addressed to *Shri Amiyararan Mookherjee M.A.*, the Prof-in-charge of our College Patrika.

Books for Intermediate Students

Rhetoric and Prosody

Based on the Lecture Notes
of
Prof. PHANI BHUSAN MUKHERJEE, M.A.

Price : Re. 1/8 only

Intermediate Substance

Based on the Tutorial Notes
of
Prof. PHANI BHUSAN MUKHERJEE, M.A.

To be published on 7. 12. 45.

503

জয় হিন্দ্

নেতাজী, প্রণাম।

আমার জননী জন্মভূমি
ওই যে দাঁড়ায়ে দূরে।

ওই যে, ওই যে কিছু দূরে—
নদীর ওপারে,
ওই
অরণ্যের পারে,
ওই
পর্বতের কোণে—
মরি মরি !—

যাবো, যাবো,
ও-মা, যাবো
বিজয়ীর মতো, দেখো, যাই।
পথে যদি মৃত্যু আসে—
ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যদি,—
পরোয়া করি না,
জানি
শহীদের মতো নিয়া যাবে
তারপর শেষ স্বপ্নে
চুমি' যাবো সেই ধর্ম-পথ
যে-পথে 'আজাদ হিন্দ'
হুংকারিয়া যাবে 'দিল্লী-পথে'।
দিল্লী পথ :
জয়-পথ—
মুক্ত আলোক পথ,
বন্ধুগণ,
দিল্লী-পথে চলো।—

যাবো, যাবো,—
হে বীরেশ,
বিজয়ীর মতো, দেখো, যাই।

ASUTOSH COLLEGE
ESTD. 1916
LIBRARY